চতুর্থ অধ্যায়

নাট্যকার মনোজ মিত্রের জীবনদৃষ্টি

চতুর্থ অধ্যায়

নাট্যকার মনোজ মিত্রের জীবনদৃষ্টি

কোনো একজন মানুষের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে তাঁর বেড়ে ওঠার পরিবেশ, পরিবার এবং অঞ্চলের বিশিষ্ট প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। শৈশবে যে ভাবনা এবং ধারণার সঙ্গে পরিচয় ঘটে, পরবর্তী জীবনে তার দ্বারা কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত হয় মানুষ। যাঁরা সৃজনকর্মে যুক্ত থাকেন তাঁদের সৃষ্টিকর্মে সেই শৈশব-অর্জিত অভিজ্ঞতা কোনোভাবে প্রতিফলিত হয়। চেতন বা অবচেতনে থেকে যাওয়া সেইসব ভাবনা এবং ধারণা জীবনের পরবর্তী অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে তাঁর জীবনবোধের মৌল কাঠামোটি গড়ে তোলে। যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই এই গড়ে ওঠার পৃষ্ঠপটটি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত সৃজনশীল মানুষের ক্ষেত্রে তাঁদের সৃজনকর্মটিকে বুঝে নিতে জীবনবোধ গড়ে ওঠার পটভূমিটি উপলব্ধি করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নাট্যকার মনোজ মিত্র জন্মেছেন অবিভক্ত বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার ধূলিহর গ্রামে। জীবনের প্রথম বারো বছর তিনি সেখানেই কাটিয়েছেন। এই বারো বছর তাঁর জীবনের গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। খুলনা অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষের শান্তভাব, সরলতা, সহিষ্ণুতা, উদারতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জলজঙ্গলের সম্পদ প্রভাব ফেলেছে তাঁর ভাবনায়। জল-গাছ-মাটির সাহচর্যে বেড়ে ওঠা জীবন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সেখানে। নিজেও পেয়েছেন প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্য। সেই খুলনা অঞ্চলের বর্ণনা মনোজ মিত্র দিয়েছেন এভাবে ঃ

> ''খুলনা চিরকালই বড় শান্ত সরল উদাসী আর সহিষ্ণু। জলজঙ্গলের সম্পদে ভরা, দুর্বারাজ আর দুর্বাকমল ধানে ঠাসা এমন পয়স্বিনী ভূমি গোটা বাংলায় আর কোথায় ছিল? দুধের মতো সাদা মনের মানুষ সব।''[১]

এই অঞ্চলের মানুষের সহজ সরল শান্তভাব আর কৌতুকপ্রিয়তার কারণ হিসেবে মনোজ মিত্র নির্দেশ করেছেন মাটির গুণকেই ঃ

> '' বনের মধু থেকে খেতের ফসল, নদীর মাছ থেকে গোরুর দুধ — সবই অঢেল, অপর্যাপ্ত। বোধকরি সেই কারণেই এ অঞ্চলের মানুষ শান্ত সহজ সরল, আর স্বভাবত কৌতুকপ্রিয়। কাজে কাজেই একটু আবার ঢিলেঢালা অলস প্রকৃতির। সবই মাটির গুণে।''[২]

এই সহজ সরল, কিছুটা ঢিলেঢালা জীবনের ছবি মনোজ মিত্রের অনেক নাটকেই লক্ষণীয়। ছোটোবেলায় প্রত্যক্ষ করা সেই প্রকৃতি-লালিত জীবনের ধারণাকেই তিনি বহন করে চলেছেন। সে জীবনে গাছপালা-নদনদী ছিল মানুষের পরম বন্ধু, নির্ভরতার আশ্রয় ঃ ''বেত্রবতী কূলে সুঁদোরবনের গা-ঘেঁষা গ্রামগুলিতে মানুষের সঙ্গীসাথী ছিল গাছপালা। ... ভৈরব-কপোতাক্ষ-বেত্রবতী তীরে জীবন ছিল গাছের মতোই অজঙ্গম এবং মূক।''[৩]

প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্যের পাশাপাশি ছোটোবেলায় মনোজ মিত্র পেয়েছেন বর্ধিষ্ণু একান্নবর্তী পরিবারে বেড়ে ওঠার সুযোগ। পরিবার থেকেই তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে উদার জীবনবোধ গড়ে ওঠার উপকরণ। মূল্যবোধের শিক্ষা তিনি পেয়েছেন প্রধানত ঠাকুমা এবং বাবার আচরণের মধ্য দিয়ে। তাঁর বাবা অশোক মিত্র ছিলেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক। ১৯৪২-এর মন্বন্তরে বাংলাদেশের কৃষকেরা ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে মহাজনদের হাতে

তারা নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। এই মামলার নিষ্পত্তির জন্য ঋণসালিশী বোর্ড যে বিশেষ আদালত গঠন করেছিল, অশোক মিত্র ছিলেন সেই ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক। তাঁর পক্ষপাত ছিল সবসময়ই কৃষকের প্রতি। মনোজ মিত্র লিখেছেন ঃ "চাকরির পরিস্থিতিতে যতই বৈচিত্র্য থাক, হাকিমের রায়ে কোনো রকমফের ছিল না। কলমের খোঁচায় সর্বদাই দরিদ্র কৃষক জিতে যায়, হেরে মরে বিত্তবান উত্তমর্ণ।"[৪] পরবর্তীকালে মনোজ মিত্রের অনেক নাটকেই যে শেষ পর্যন্ত অসহায়, প্রান্তিক মানুষের জয় লক্ষিত হয় তার বীজ প্রোথিত ছিল সেই ছোটোবেলায় প্রত্যক্ষ করা বাবার আচরণের মধ্যে। শোষিত, অসহায় মানুষের পক্ষ নেবার জন্য তাঁকে কোনো বিপ্লবের তত্ত্বের পাঠ নিতে হয় নি, সে শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন বাড়িতেই। মানসিক প্রসারতার শিক্ষা তাঁর হয়েছিল ঠাকুমা হেমনলিনী দেবীর মাধ্যমে। হেমনলিনী যেন বাংলাদেশের সেই হারিয়ে যাওয়া মমতাময়ী পরহিতৈষী, যাঁরা একসময় ছিলেন প্রায় প্রতিটি পরিবারেই। গ্রামের প্রত্যেকের অভাবের তালিকা করে পুত্রদের কাছে তিনি পত্র পাঠাতেন সেই অভাব পূরণের উপকরণ পূজার সময় নিয়ে আসার জন্য। হেমনলিনীর মধ্য দিয়েই শৈশবের মনোজ মিত্র জেনেছেন উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য। জেনেছেন, উৎসবের কয়েকটা দিন প্রাত্যহিক তুচ্ছতাকে উপেক্ষা করে, আত্মকেন্দ্রিকতা ভুলে গিয়ে মানুষ মুক্ত ও প্রসারিত হয়ে উঠত। নিজের চোখে দেখেছেন, পুজো উপলক্ষে চন্ডীমন্ডপের উঠোনে ছোটো ছোটো দোকানের যে বাজার বসত, সেখানে হেমনলিনী দেবী চাষিবউদের ধরে ধরে কাচের চুড়ি পরাতেন, খাস্তাগজা-জিলিপি-পাঁপড়ভাজা খাওয়াতেন। এই যে সকলকে নিয়ে আনন্দ করা — জীবনের মুক্তি এখানেই। নিজের পরিবারে মনোজ মিত্র দেখেছেন নিত্য অতিথির সমাগম — উৎসবের সময় স্বাভাবিকভাবেই তা কয়েকগুণ বেড়ে যেত। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই এসময় বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করত। অতিথি আপ্যায়ন করেই বাড়ির মেয়েদের উৎসবের দিনগুলি কেটে যেত। ধূলিহরের মিত্র বাড়িতে উৎসব ছাড়া অন্যান্য দিনেও ছিল অতিথি সমাগম। স্কুলের মাস্টারমশাই, পুরুতঠাকুরমশাই, নায়েব, গোমস্তা ছাড়াও কিছু আত্মীয়-অনাত্মীয় ছিল সেই বাড়ির স্থায়ী বাসিন্দা। এছাড়া আসতেন অনুদান প্রাপকের বংশধরেরা। এই 'এসো-জন বসো-জন'রা থেকে যেতেন দু'তিনমাস পর্যন্ত। অতিথি অল্প সময়ের জন্য এলে বাড়ির সকলের মন খারাপ। দিন দশেকের আগে তাই কাউকেই ছাড়া হত না। অতিথিরাও রয়ে যেতেন। কেবল বিশেষ কোনো পরিবার নয়, সাধারণভাবে এ ছিল সে সময়কার যে কোনো বর্ধিষ্ণু পরিবারের ছবি। মনোজ মিত্র লিখেছেন ঃ "গৃহস্থ কি অতিথি, কোনো পক্ষের কোনো তাড়া ছিল না। জীবন ছিল ওইরকম, শ্যাওলাছাওয়া পুকুরের জলের মতো নিথর নিশ্চল।"[৫] এরকম শিথিল প্রসারিত মানস-পরিবেশেই বড় হয়ে ওঠেন তিনি। এ এমনই এক পরিবেশ, যেখানে অতিথি এসে নিজেরই ঘরদোর বেছে নিতেন, গৃহস্থের পুকুরে মাছ বড় হয়ে গেছে দেখে বিক্রি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, বাড়ির ছোটো ছেলেদের পড়ার তদারকি করতে শুরু করতেন। এ এমনই এক পরিবেশ, যেখানে সন্ধেবেলা ছেলেদের পড়ার হ্যারিকেন টেনে নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে মহাভারত পাঠ শুরু করে দিতেন পুরোহিতমশাই। স্লেট, পেন্সিল, বর্ণপরিচয়, ধারাপাত ভুলে ছেলেরাও সেই আসরে মজে যেত। পরবর্তী জীবনে মনোজ মিত্র দেশভাগের ফলে ভারতে চলে এসেছেন, ক্রমশ অভ্যস্ত হয়েছেন নগর জীবনে, কিন্তু বুকের মধ্যে লালন করেছেন সেই ধূলিহরের পরিবেশ। তাই তিনি আক্ষেপ করেছেন ঃ "ইংলন্ডের রাজপরিবারকে এখনো বাঁচিয়ে রাখা গেছে যখন, আমাদের বাংলার একটি একান্নবর্তী পরিবারকেও সংরক্ষণ করে রাখা যেত যদি।"[৬]

এই ধরণের আক্ষেপ মনোজ মিত্রের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, কারণ তিনি একটু পুরনো ধরণের মূল্যবোধে বিশ্বাসী। আধুনিককালে মানুষ যখন প্রবলভাবে আত্মকেন্দ্রিক, আত্মম্ভরিতা যখন তার প্রধান অলঙ্কার, তখন মনোজ মিত্র অন্তরে লালন করেন সেই ধূলিহরের মমতাভরা আবহ, যে আবহে গৃহকর্ত্রী বাড়ির ছেলের গৃহশিক্ষকের ভবিষ্যৎ নিয়ে পর্যন্ত চিন্তা করতেন, যে আবহে ছড়িয়ে ছিল 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর অনুভব। কেবল কি মানুষ, গাছপালা-জীবজন্তু থেকে শুরু করে মৃন্ময়ী প্রতিমাও সেখানে ছিল আত্মার আত্মীয়। ঠাকুমাকে তিনি দেখেছেন, নির্জন দুপুরে ঝড়ে ভেঙে পড়া আমগাছের গুঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রুপাত করতে; দেখেছেন পুরোহিত ভালো ঠাকুরমশাইকে, যিনি রাতবিরেতে দেখতেন, পথের গাছপালা তাকে সঙ্গ দিচ্ছে, পাহারা দিচ্ছে। ঠাকুমা হেমনলিনী দেবী কাক পায়রা গোয়ালের গরু ছাগলকেও পেটপুরে পুজোর প্রসাদ খাওয়াতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এর ফলে ওদের পরজন্মের পথ পরিষ্কার হবে। ছোটোবেলায় ধূলিহর গ্রামে মনোজ মিত্র বড় হয়েছেন এইসব অনুষঙ্গের মাঝে, বড় হয়েছেন ঠাকুর্দার বিশাল বিশাল গোটাকয় বাগানের সাহচর্যে। গাছ সেখানে কতভাবে মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। মনোজ মিত্র স্মরণ করেছেন সেই গ্রামের এক বিশাল কদমগাছকে, যে গাছের নিচে গ্রামের সব কাজিয়া বিবাদের ফয়সালা হত। সেই গাছের মেঘবরণ ছায়ার নিচে গিয়ে দাঁড়ালে বাদী-বিবাদী উভয়েরই ঝাঁঝ কমে আসত। গাছ এবং প্রকৃতি সেখানে এভাবেই শুশ্রূষা দিত মানুষকে। সেই ছায়াঘন মায়াময় পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা মনোজ মিত্রের মধ্যে জন্ম দিয়েছে বিশিষ্ট এক মূল্যবোধের। এই মূল্যবোধের ধারণা আধুনিক দৃষ্টিতে কখনো কখনো 'সেকেলে' কিন্তু তাতেই তিনি স্বচ্ছন্দ। কালের দিক থেকে যে জগতে তাঁর অবস্থান, ভাবনার দিক থেকে তাঁর মধ্যে রয়ে গেছে সেই জগতের বিপ্রতীপ কিছু অনুভব। কেজো জগতে অনেকসময় তাঁর সনাতন ধারণা হয়তো বিরোধ সৃষ্টি করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এরকমই তাঁর মানসগঠন। সেই মানসগঠনের কারণেই অধ্যাপক হয়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় তাঁর নিজের কাছেই গর্হিত মনে হয় : "আমি নিজেই এ ব্যাপারে রক্ষণশীলদের দলে। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনার সঙ্গে চলচ্চিত্রাভিনয় মেলানোর মত মানসিক প্রসারতা বা উচ্চতা আমার নেই।"[৭] পরবর্তী জীবনে সেই রক্ষণশীল মূল্যবোধকে তিনি লালন করেছেন জীবনে, প্রতিফলিত করেছেন নিজের সৃষ্টিতে। সংসার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে মূল্যবোধকে ধ্বস্ত হতে দেখে তিনি পীড়িত, ব্যথিত এবং ক্রুদ্ধ হয়েছেন। যে কোনো উপায়ে মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকেই নিজের সৃষ্টির লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছেন।

'নেকড়ে' (১৯৬৮), 'চাক ভাঙা মধু' (১৯৬৯), 'শিবের অসাধ্যি'(১৯৭৪), 'নরক গুলজার'(১৯৭৪), 'মেষ ও রাক্ষস'(১৯৭৯), 'রাজদর্শন'(১৯৮১), 'নৈশভোজ'(১৯৮৪), প্রভৃতি নাটকে মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখেছেন সমাজ ও রাষ্ট্রে। শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বে মনোজের স্পষ্ট পক্ষপাত এখানে শোষিতের প্রতি, কিন্তু সেই পক্ষপাত প্রকাশিত শিল্পের শর্ত মেনেই। 'নেকড়ে' বা 'চাক ভাঙা মধু'তে মনোজ মিত্র ক্রোধী। তাই কংসারি ঠাকুর বা অঘোর ঘোষের ওপর নেমে আসে নীহারি বা বাদামীর প্রতিশোধ। শোষকের প্রতি এখানে ক্ষমাহীন নাট্যকার। ১৯৭৪-এ লেখা 'শিবের অসাধ্যি'তে তিনি কিন্তু কোনো আশার আলো দেখাতে পারেন নি। মানুষের আত্মশক্তির ওপর শেষপর্যন্ত তাঁর যে আস্থা স্থাপন তা অনেকটা আরোপিত ইচ্ছাপূরণ থেকে গেছে, মূল নাট্যবিষয়ের স্বাভাবিক পরিণতি হয়ে উঠতে পারে নি। 'নরক গুলজার'-এ মনোজ মিত্র আবার ক্রোধী। শ্লেষবাক্যে পাপী-

তাপীকে বিদ্ধ করার পর শেষপর্যন্ত সরাসরি লড়াইয়ে নামিয়েছেন মানিকচাঁদকে। শেকল ছিঁড়ে বেরিয়েছে সর্বহারা মানিক। নিজের সন্তানের জন্য, পরিবারের জন্য এক সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছে সে। তার কাছে পরাজিত হয়েছে সব অত্যাচারী। আসল লড়াইয়ের জন্য মানিককে মর্ত্যে পাঠিয়েছেন নাট্যকার। আর অত্যাচারীদের সঙ্গে ভগবানকেও গাভীরূপে মর্ত্যে পাঠিয়েছেন, যে গাভী নানাভাবে সেবা করবে মানিকদের। মনোজ মিত্র মানিকদের জয় চান এবং সেই জয়ের পথে সব বাধা দূর হবে বলেই তিনি বিশ্বাস করেন। যারা মানিকদের পদানত করতে চায়, শোষণ করতে চায় — তাদের এবং তাদের আশ্রয়দাতাদের গাভী রূপ দিয়ে মানিকের হাতে তুলে দেওয়ার মধ্যে তাঁর সেই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে। 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে মনোজ মিত্র নির্দিষ্ট কোনো ইজমের পরিবর্তে রাক্ষস দমনে জোর দিয়েছেন মানুষের শুদ্ধ চৈতন্যের ওপর। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ বা বাইরে থেকে আরোপিত কোনো তত্ত্বের দ্বারা মানুষের মুক্তির পরিবর্তে তিনি এখানে এই দার্শনিক উপলব্ধির দিকে আমাদের নিয়ে যান যে, মানুষ ভুল করে, অজ্ঞানে পাপ করে, আবার সেই মানুষই অনুতাপে দগ্ধ হয়, নিজের পাপ নিজেই খন্ডন করে শুদ্ধ চৈতন্যে অভিষিক্ত হয়। তাঁর জীবনদৃষ্টি এখানে দার্শনিক প্রজ্ঞার দ্বারা ভাবলোকে উন্নীত। 'রাজদর্শন' নাটকেও মনোজ মিত্র শেষপর্যন্ত দেখান অভিরামের জয়। পরনির্ভরশীল লম্বোদরকে অভিরাম যেভাবে প্রাণিত করেছে, আহ্বান জানিয়েছে নতুন জীবনের দিকে – সে আহ্বান প্রকৃতপক্ষে নাট্যকারেরই। 'নৈশভোজ' নাটকে অসংখ্য সামাজিক শেয়ালের মুখে ছাই দিয়ে শেষপর্যন্ত তুষ্টুকে বাঁচিয়ে রাখেন মনোজ মিত্র। উদ্বোধন ঘটান তার চৈতন্যের। তুষ্টুর পক্ষে তিনি দাঁড় করান ঢ্যাঙাকে, গরিবের পক্ষে গরিবকে। এই দাঁড়ানোতে কোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব নেই, আছে মানবিক সহানুভূতি।

রাষ্ট্র কিংবা সমাজের মতোই পরিবারের ক্ষেত্রেও মনোজ মিত্রের লক্ষ্য মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বিশ শতকের সাতের দশকের সূচনায় লেখা 'কেনারাম বেচারাম' (১৯৭০) বা 'পরবাস' (১৯৭০) নাটকে মনোজ মিত্র দেখিয়েছিলেন আশ্রয়হীনতার সমস্যা। বেচারাম চাটুজ্যে পরিবারে অবাঞ্ছিত আর কেনারামের কোনো পরিবার নেই। পরিবারের প্রতি বিতৃষ্ণায় ঘর ছেড়েছিলেন যে বেচারাম, যাত্রাপার্টিতেও তিনি 'ফিট' হতে পারেন নি, কারণ সেখানেও চরম বৈষম্য। কিন্তু তিনি চান নিজের একটা জায়গা ঃ "একটা জায়গা আমার দরকার ... উটকো শ্যাওলার মতো আর ঘুরতে পারিনে ... একটা জায়গা ... নিজের জায়গা ..."[৮] এই আর্তিকে ব্যর্থ হতে দেন না মনোজ মিত্র। সমস্ত লোভ এবং স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে উঠে যে শিশু জিজ্ঞাসা করতে পারে 'রাজা, তোর কাপড় কোথায়?', তেমনি এক শিশুকণ্ঠকে উপস্থাপিত করেন তিনি চরম সংকটের মুহূর্তে। স্বার্থশূন্য ভালোবাসা নিয়ে সে বেচারামের পথ রোধ করে দাঁড়ায় ঃ "না। তুমি যাবে না। ... তুমি থাকবে ... আমার কাছে থাকবে !"[৯] বিবেকের মতোই সে উচ্চারণ করে যে, টাকা এবং গয়নার জন্য নকল একটা লোককে সকলে 'বাবা' বলে মেনে নিয়েছে। বেচারামবাবু যে শেষপর্যন্ত সবকিছু ফিরে পান, পরিবারে আবার 'ফিট' হয়ে যেতে পারেন তা আরোপিত ইচ্ছাপূরণ মনে হতে পারে কিন্তু এটাই মনোজ মিত্রের নাটকের বৈশিষ্ট্য। এখানেই তাঁর উদার জীবনদৃষ্টির পরিচয়। অসহায়, অবহেলিত—যাঁদের সংসার দূরে ঠেলে দিতে চায়, তাঁদের সংসারে প্রতিষ্ঠিত করেন মনোজ মিত্র। এই করাটা কিন্তু ঘটে নাটকের শর্ত মেনেই। মানুষকে আরো একবার সুযোগ দিতে চান তিনি। তাই তাঁর নাটকে অনুতপ্তরা ক্ষমা

পেয়ে যায় — দীপ্তি, বুড়ি, প্রদীপ, শুভেন্দু, চারু — সকলেই হাসিমুখে বেচারামবাবুর পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। সবকিছু যথাযথ এবং যথাস্থানে রেখে এবং দেখেই মনোজ মিত্র এভাবে আঁকড়ে রাখতে চান নিজের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ। 'পরবাস'-এর গজমাধবের পরিবার নেই, দীর্ঘ ছত্রিশ বছর সে কাটিয়ে দিয়েছে গলু ওস্তাগর লেনের বাসাবাড়িতে। মামলায় হেরে সেখান থেকে উচ্ছেদ হতে হচ্ছে তাকে। এখানেও প্রবল আশ্রয়হীনতার সমস্যা। কোথায় যাবে গজমাধব? নানা ছুতোয় সে 'টাইম কিল' করে। শেষপর্যন্ত কিন্তু আর এক অনিকেত মন্দিরাকে সে ঘর ছেড়ে দিয়েছে। নিজের জীবনের অপূর্ণ সাধ পূরণ করতে চেয়েছে মন্দিরা-রতনের সংসার গড়ে ওঠার মধ্যে। মনোজ মিত্রের সহানুভূতি এখানে দেখাতে চেয়েছে, নিজেরা অনিকেত বলেই গজমাধব ও মন্দিরা পরস্পরের সমব্যথী হতে পেরেছে। মন্দিরা নিজের কাছে রেখে দিতে চেয়েছে গজমাধবকে, আর গজমাধব নিজের 'ঘর' ছেড়ে দিয়ে গেছে মন্দিরাকে। আশ্রয়ের বিনিময়েও চেয়েছে জীবনে অন্তত একটি দিনের পূর্ণতা। ঘর ছেড়ে পথে নামলেও সে পেয়েছে মন্দিরার সহমর্মিতা, পেয়েছে পাঠকের সহানুভূতি। অসহায়, স্নেহবুভুক্ষু মানুষকে এই সহানুভূতিতে উত্তীর্ণ করে দেওয়াই মনোজ মিত্রের জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতা, যাকে সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি জানিয়েছেন বিশিষ্ট সমালোচক ঃ

> " কাফকার নিরাশ্বাস ভয়ংকর ভবিতব্য থেকে মনোজ আমাদের আস্তিকতায় ফিরিয়ে আনেন, এখানেই তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন, মানবিকতার গভীর সূত্রেই তাঁর সমস্ত নাটকগুলি বাঁধা পড়ে। তাঁর সহানুভূতির বিস্তার দেখবার মতো। গজমাধবের মতো এক নিঃসঙ্গ মানুষ নিজের নিঃসঙ্গতার মূল্যেই অন্যের 'সাজানো ঘরের চেহারা'-কে অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রাখে।"[১০]

আধুনিক প্রজন্মের মূল্যবোধে ভাঙনের চেহারাটা স্পষ্ট তুলে ধরেছেন মনোজ মিত্র তাঁর 'দম্পতি' নাটকে। জীবনের প্রান্তসীমায় উপনীত মানুষের আশ্রয়হীনতার সমস্যা এখানেও প্রকট। মানুষ আশ্রয় পায় সম্পর্কের কাছে, আপনজনের কাছে, বিশ্বাসের কাছে। সমাজ তথা পরিবারে এই আশ্রয়ের ও আশ্বাসের অভাব পীড়িত করেছে মনোজ মিত্রকে। তিনি দেখিয়েছেন, কর্তা-গিন্নি-জিতেনবাবুর মতো মানুষদের অসহায়তা। নতুন যুগের নতুন ধরণ তাঁরা বুঝতে পারেন না। স্নেহসম্পর্ক এযুগে শিথিল, মূল্যহীন। তাই বড়খোকা জিতেনবাবুকে এককালীন কিছু টাকা দিয়ে বাবার চিকিৎসার ঋণমুক্তির দম্ভ অর্জন করতে চায়। কর্তা-গিন্নির সঙ্গে জিতেনবাবুর সম্পর্কের গভীরতার কোনো আন্দাজই তাদের নেই, বা থাকলেও তাকে গুরুত্ব দিতে চায় না। নতুন প্রজন্মের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি কাতর করেছে মনোজ মিত্রকে। আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তিনি সমাজ তথা পরিবারকে এই বৈনাশিক বোধ থেকে রক্ষা করতে। তাঁর জীবনদৃষ্টির প্রসারতা এমনই যে, বাবা-মা দুই ছেলের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে বহুদিনের পুরনো চাকর কানাইয়ের কী হবে সে ভাবনাও গুরুত্ব পায় নাটকে। ওপরতলার ভাড়াটে বকুল-শ্যামলের দাম্পত্যের মধ্যে দিয়েও তিনি দেখান একালের সম্পর্কের ভঙ্গুরতা। কিন্তু সেই ভাঙনকে চরম পরিণতি পর্যন্ত নিয়ে যেতে তিনি নিজেই যেন আশঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাই শেষপর্যন্ত আবার তাদের ফিরিয়ে আনেন সুস্থ বোধে, অবসান ঘটান ভুল-বোঝাবুঝির। এমনকি তাঁর 'সর্বব্যাপী সহানুভূতি' দোলনকেও উত্তীর্ণ করে দেয় পাঠক-দর্শকের সহমর্মিতায়। আর জিতেন ডাক্তারের মাধ্যমে তিনি দেখান পুরনো মূল্যবোধের জয় — অর্থপ্রত্যাশী ছেলেদের অর্থের প্রত্যাশা মিটিয়ে বেনামিতে নিজেই বাড়ি কিনে নিয়ে কর্তা-গিন্নিকে রেখে দেন সেখানেই। এই পুরনো মূল্যবোধ উদার এবং ক্ষমাপরায়ণ। তাই স্বার্থান্ধ ছেলেরাও শেষপর্যন্ত ক্ষমা পেয়ে যায় — আরো একবার সুযোগ পেয়ে

যায় নিজেদের শুধরে নেবার। 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'য় (১৯৮৮) যে ভাঙনের ছবি এঁকেছেন মনোজ মিত্র তা আসলে আধুনিক সমাজের সমস্যা, যা তিনি প্রতিফলিত করেছেন একটি পরিবারের আধারে। কিন্তু ভাঙনকেই চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নিতে তিনি যেন ভয় পান, নিজের বিশ্বাসের ভূমি থেকে চ্যুত হবার আশঙ্কায় পীড়িত হন। তাই উন্মার্গ সময়ে তিনি সৃষ্টি করেন অলকানন্দার মতো এক 'মা'কে, যে কিনা সন্তানকে রক্ষা করে সমস্ত ঝড়-ঝাপ্টা থেকে। অসহায়, দুর্বল মানুষকে ধুলো ঝেড়ে কোলে তুলে নেবার মতো মানুষের অভাব সংসারে কোনোদিন হয় না, মানবিকতার স্নিগ্ধ কোমল ধারাটি এঁদের দ্বারাই রক্ষিত হয় — নিজের এই বিশ্বাসবোধকেই মনোজ মিত্র রূপায়িত করেন অলকানন্দার মধ্য দিয়ে। দেবাহুতির মতো চরিত্রের বিপ্রতীপে আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অলকানন্দার সর্বংসহা মাতৃসত্তা। ধ্বস্ত মূল্যবোধ এবং ধ্বস্ত মানবিকতার ওপর জীবনের সুধাপাত্র হাতে অলকানন্দাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নাট্যকার মনোজ মিত্র। আত্মকেন্দ্রিকতা যখন মানুষকে প্রবলভাবে গ্রাস করেছে তখন মনোজ মিত্র বিশ্বাস করতে চান সেই মানবিকতায়, যা পরার্থে বাঁচার মধ্যেই খুঁজে পায় জীবনের সার্থকতা ঃ "কারুর জন্যে কিছু করতে না পারলে, আমি কী নিয়ে থাকব। ফাঁকা হয়ে শূন্য হয়ে বাঁচব কী করে ভাই?"[১১] এই ভাবনার উৎস যে ধূলিহরের একান্নবর্তী পরিবার এবং পরহিতৈষিণী হেমনলিনী দেবীর মধ্যেই ছিল তা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না।

পরিবারে মূল্যবোধের ভাঙনের সমস্যাকে মনোজ মিত্র একটু বিস্তৃত সামাজিক পরিসরে দেখেছেন 'আত্মগোপন', 'রঙের হাট', 'কুহুযামিনী' প্রভৃতি নাটকে। ব্যথিত চিত্তে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন আধুনিক সমাজের বাজারসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। কে কত বেশি দামে বিকোবে তাই নিয়ে চলছে তীব্র প্রতিযোগিতা। সকলেই নিজের নিজের দর যাচাই করছে। সর্বোচ্চ দামের চরম মুহূর্তটিতেই মানুষ বিক্রি হবে। সেই মুহূর্তটি চিনতে পারাই আসল কাজ। ফস্কে গেলেই মানুষ মূল্যহীন। বাজার গ্রাস করে নিয়েছে মানুষের স্নেহ-মায়া-মমতা-সহানুভূতি-সহমর্মিতা, নীতি-নৈতিকতা ইত্যাদি সবকিছুকে। কিন্তু এই বৈনাশিকতাই কি জীবনের শেষ সত্য? নাট্যকার মনোজ মিত্র তা বিশ্বাস করতে পারেন না। তাই খাদের অতলে তলিয়ে যাবার মুহূর্তে মানুষকে টেনে ধরেন তিনি — চালিত করেন শুদ্ধ চৈতন্যের দিকে। 'আত্মগোপন' নাটকে তাই সহমর্মী কিছু মানুষের প্রসারিত হাত পাঁকের অতল থেকে উত্তরণে সাহায্য করে অপাকে — তীব্র নৈরাশ্যের মধ্যেও একঝলক আলোর ইশারা জাগায়। এই ইতিবাচকতাই মনোজ মিত্রের জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতা। একইভাবে 'রঙের হাট' নাটকে তিনি দেখিয়েছেন, ভুবনজোড়া বাজারের মধ্যেও আজও মায়া-মমতা-ভালোবাসা সবচেয়ে মূল্যবান। তাই মমতা বাজি রেখে শেষপর্যন্ত জিততে পারে না খালপাড়ের মেয়ে শান্তা। দালাল ফজলু তাই আগলে রাখে ফুটুকে — রক্ষা করে 'দুনিয়ার মানইজ্জত'। ফজলু যে বিশ্বাস ব্যক্ত করেছে তা আসলে নাট্যকার মনোজ মিত্রেরই বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের জগতেই তাঁর অবস্থান ঃ

> "দ্যাখো বহিন, বাজারে দেহ-র কোনো দাম নেই... ঐ খালপাড়ে জন্মেও দেখেছি, এপারে এসেও দেখছি ... গরু-ছাগলেরও দাম নেই আমার মা-বহিনেরও নেই। দাম যেটুকু যা আছে তা ঐ খোদাতালা তোমার কলজে ভরে যা দিয়েছেন ঐ মায়া মমতা ভালোবাসা – ঐ যে মণিমুক্তাগুলো – ঐগুলোরই দাম।"[১২]

এইসব মণিমুক্তার সংরক্ষণই তো মনোজ মিত্রের লক্ষ্য। 'কুহুযামিনী' নাটকেও তিনি শেষপর্যন্ত জীবনকে

ইতিবাচকতায় থিতু করেন। বিপদের সময় জোনাকি ফিরতে চায় স্বামী চন্ডীর কাছে। নাট্যকার দেখাতে চান, গৃহের বন্ধনই মানুষের শেষ আশ্রয়। জোনাকি শেষে তাই জায়গা পায় চন্ডীর পাশে, আবীরও ক্ষমা পেয়ে যায় নাট্যকারের।

নাট্যকার মনোজ মিত্র আধুনিক জীবন ও সমাজে সন্ধান করেছেন সঙ্গতি, সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্যের। যেখানেই এসবের অভাব দেখেছেন, সেখানেই তার হৃদয় বেদনার্ত হয়েছে। কখনো তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, কখনো নিজের মতো করে প্রয়াস জারি রেখেছেন, কখনো তীব্র ক্রোধে প্রত্যাখ্যান করেছেন তথাকথিত নাগরিক আধুনিকতাকে। 'আমি মদন বলছি' নাটকে সৌন্দর্য-সন্ধানী মদনের চোখ দিয়ে নাট্যকার দেখেছেন সমাজের উঁচুতলার মানুষের ভেতরকার কুৎসিত দিকটি। 'সোন্দরের পূজারী' মদন নাগরিক জীবনে কোথাও সৌন্দর্য খুঁজে পায় নি। 'মদনের পঞ্চকান্ড'তেও মনোজ মিত্র মদনের চোখে দেখেছেন পরিবার তথা সমাজের অন্তঃসারশূন্য রূপটিকে। প্রত্যাশিত সৌন্দর্যের সন্ধান না পেয়ে মদন প্রত্যাখ্যান করেছে নাগরিকতাকে। এই প্রত্যাখ্যান আসলে নাট্যকারেরই। এই নাট্যকারই আবার 'দন্তরঙ্গ' নাটকে নিজের পরিচিত প্রতিবেশে স্থিত। পারস্পরিক সহমর্মিতার প্রকাশে উজ্জ্বল এই একাঙ্কটি। মনোজ মিত্র অনুভব করেছেন, এই ছুটন্ত সময়ে ব্যথা অনুভব করার সময় নেই মানুষের। এই সমাজ সবাইকে অচেতন করে রেখেছে। গভীর দার্শনিক প্রজ্ঞায় মনোজ মিত্রের চরিত্র উচ্চারণ করেছে ঃ "ব্যথারা হারিয়ে যাচ্ছে। বিদায় বিচ্ছেদ কালে কালে সব ড্রাই হয়ে ঝুলে পড়ছে। এই সময় ... এই সমাজ ... সবাইকে অ্যানাসথেসিয়া করে রেখেছে।"[১৩] পোষা কুকুরের জন্য না, দাঁতের জন্য না, প্রিয়জনের জন্য না — আধুনিক মানুষ কারো জন্যই ব্যথা অনুভব করে না। নাট্যকার মনোজ মিত্র এই ব্যথার অনুভব জাগাতে চান। তিনি বোঝাতে চান, পরিবার মানে আসলে পরস্পরের জন্য কষ্ট ভোগ করা। সেই কষ্ট ভোগের আনন্দেই পরিবারের সম্পূর্ণতা। সেই আনন্দ পেতেই মনোজ মিত্রের চরিত্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঃ " না। নকল দাঁত আমি পছন্দ করি না। যে দাঁত জীবনে টাটাবে না ... কষ্ট দেবে না ... যার কখনও ব্যথা চাগাবে না ... সেই নিষ্ঠুর নির্দয় বাঁধানো দাঁতের কোন স্থান নেই আমার চোয়ালে।"[১৪] ব্যথা না দিলেও যে কোনো কিছুকে 'নির্দয় নিষ্ঠুর' মনে হতে পারে সেই দার্শনিকতায় উত্তীর্ণ করে দিয়ে মনোজ মিত্র বোঝান, পরিবার আসলে পরস্পরের দুঃখ কষ্টকে ভাগ করে নেওয়া, পরস্পরের সহমর্মী হওয়া। কৃত্রিমতা নয়, স্বাভাবিকতাতেই জীবনের প্রকৃত ছন্দ খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

মনোজ মিত্রের জীবনদৃষ্টির আরেকটি বিশিষ্ট লক্ষণ অবহেলিত, অবজ্ঞাতকে জীবনযুদ্ধে জিতিয়ে দেওয়া। এ যেন তাঁর রক্তের উত্তরাধিকার। ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক পিতা অশোক কুমার মিত্র কলমের খোঁচায় জিতিয়ে দিতেন দরিদ্র কৃষককে, আর পুত্রও কলমের খোঁচায় সারা জীবন জিতিয়ে চলেছেন কেনারাম বা বেচারাম, গজমাধব, বাঞ্ছারাম, তুষ্টু চামার, ঘন্টাকর্ণের মতো অসহায়, প্রান্তিক মানুষকে। এই মানুষেরা সমাজের বিরাট গণ্যমান্য কেউ নয়, সংসারেও এদের প্রয়োজনীয়তা সামান্যই। কেজো জগতের বিচারে এদের বাতিল মানুষই বলা চলে। মনোজ মিত্রের পুরনো ধরণের মূল্যবোধ সহানুভূতি বোধ করে এই অসহায় মানুষগুলির প্রতি। পুরনো মাত্রেই বাতিল — আধুনিকতার এই তত্ত্বের বিপ্রতীপতায় তাঁর যাত্রা। যে সহমর্মিতা হারিয়ে যাচ্ছে পরিবার তথা সমাজ থেকে, এই মানুষদের স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠা দিয়ে তাকেই সবলে ফিরিয়ে আনতে চান তিনি।

শিল্পের শর্ত যথাযথ মান্য করেই রচনা করেন এঁদের জয়ের প্রেক্ষাপট। তাই বেচারাম শেষ পর্যন্ত ফিরে পান সংসারে নিজের প্রতিষ্ঠা, গজমাধব ঘর হারিয়ে পথে নামলেও মন্দিরা এবং পাঠক-দর্শকের সহানুভূতিতে চিরভাস্বর হয়ে থাকে, সমস্ত প্রতিকূলতা এবং ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে প্রবলভাবে বেঁচে থাকে বাঞ্ছারাম, ঘন্টাকর্ণ রুখে দাঁড়ায় শোষকের বিরুদ্ধে, বড়লোক বন্ধুদের করুণাকে উপেক্ষা করে নীতিশ আর শ্যামা নিজেদের পঞ্চম বিবাহবার্ষিকী, নিজেদের 'সাতুই ফাল্গুন'কে উজ্জ্বল করে তোলে, গাঁয়ের বধূ মরালী, বেণীর মুখের ওপর চারটি দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে স্বামী কেষ্ট-দুলালের সম্মান রক্ষা করে।

দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে 'সর্ব্ব-ব্যাপী সহানুভূতি'র কথা বলেছেন, মনোজ মিত্রের সহানুভূতি অনেকটা সেই গোত্রের। ছোটো, বড়ো, প্রান্তিক — কোনো চরিত্রই তাঁর সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়নি। এই সহানুভূতি একদিকে যেমন বর্ষিত হয়েছে অসহায়, দুর্বলের প্রতি, অন্যদিকে খল চরিত্রও তা থেকে বঞ্চিত হয় নি। অনুতাপের আগুনে পুড়ে যখন শুদ্ধ হয় তাঁর চরিত্ররা, তখন নাট্যকারের প্রসন্ন দৃষ্টি বর্ষিত হয় তাদের ওপর। 'দম্পতি' নাটকে যেমন বাড়ি বিক্রির টাকা ভাগ করে নিয়ে মা-বাবাকেও ভাগ করতে চলেছিল যে দুই ভাই, তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে কর্তা-গিন্নির শুভানুধ্যায়ী জিতেনবাবু যখন নিজেই বেনামিতে বাড়ি কিনে নিয়ে দম্পতিকে গৃহচ্যুত হতে দেন নি, তখন দুই পুত্রকে তাড়িয়েই দিচ্ছিলেন জিতেন ঃ ''দেড়লাখ টাকা পেয়েছ ... হাফ হাফ হয়েছে ... সাড়ে ছ'টায় আসাম মেল ... সাড়ে সাতটায় কালকা ... ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে ... যাও খোকারা বেরিয়ে পড়ো ! এরপর কিন্তু মিনিটে মিনিটে ঘর ভাড়া চার্জ করবো ... ''[১৫]। এই সংলাপ পাঠক-দর্শককে Poetic Justice-এর স্বস্তি দেয়। কিন্তু এই রূঢ়তা, এই প্রতিশোধপরায়ণতা মনোজ মিত্রের মানস-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মেলে না। তাই বড়খোকা-ছোটখোকা মাথা নিচু করে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন জিতেনই তাদের পথ আগলায় ঃ

> ''যাচ্ছো কোথায় ? ট্যাক্সি আমি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি ! আরে আমি যেতে বললেই যাবি কেন ? জিতু কাকার ওপর তোদের জোর নেই ? আমার বাড়ি, তোদের বাড়ি না ? সেই বাড়ির গৃহপ্রবেশ আজ ! তে রাত্তির পার না করে কেউ যেতে পারবে না ! যা ঘরে যা।''[১৬]

মানুষকে তিনি এখানে এনেই দাঁড় করাতে চান। ধ্বস্ত মূল্যবোধের ওপর জয়ী করতে চান মানবিকতাকে। সেই মানবিকতার কাছে কেউ অস্পৃশ্য নয় — সকলকে নিয়েই তার সম্পূর্ণতা। সেই কারণেই সংসারে অপাঙ্‌ক্তেয় বেচারামবাবু যখন শেষে আবার নিজের সংসারে 'ফিট' হয়ে যান তখন যে পরিবারের সকলে নির্লজ্জ স্বার্থপরতায় কেনারামকে 'বাবা' বলে স্বীকৃতি দিতে চলেছিল তারাই মাথা নিচু করে এসে দাঁড়িয়েছে বেচারামের পাশে। সকলের স্নিগ্ধ হাসিতে নাটক শেষ করেছেন মনোজ মিত্র। এই হাসিতে পৌঁছনো, মানুষকে এই নির্মল হাসিতে পৌঁছে দেওয়াই নাট্যকারের অভিপ্রায়। তাঁর সহানুভূতি সেই হাসিরই পোষকতা করেছে। সহানুভূতি প্রবল বলেই 'আকাশচুম্বন' নাটকে শেষপর্যন্ত রূপা-সুপ্রিয়দের বহুতলটি ভেঙে পড়ে না। কাছের আর একটি বহুতলের ভেঙে পড়া দেখিয়ে নাট্যকার সচেতন করেন রূপা-সুপ্রিয়কে। আর একবার সুযোগ দেন জীবনের বনিয়াদ শক্ত ভিতের ওপর গড়ার।

এই সহানুভূতিরই অন্যতম রূপ পুরনোর প্রতি সহমর্মিতা, তাকে রক্ষা করার আপ্রাণ প্রয়াস,

আধুনিক যান্ত্রিক যুগে প্রাণের স্পর্শ সৃষ্টি করা। 'পালিয়ে বেড়ায়' নাটকে তাই কৈলাস অপেরার মালিক শেষপর্যন্ত ফিরিয়ে নিতে আসে বাঁশিওয়ালা রূপচাঁদকে ঃ "আমি সাফ বলে দিয়েছি, বাঁশি বাজাবে জ্যান্ত মানুষ ... এক বুক দরদ নিয়ে গাল ফুলিয়ে বাজাবে ... ও শালা সিনথেসাইজারের না আছে দরদ, না আছে ফুসফুস !"[১৭] এই 'দরদ'ই মনোজ মিত্রের অভীষ্ট। যে কোনো চরিত্রই নাট্যকার মনোজ মিত্রের সহানুভূতি-ধন্য। আসলে চরিত্র রচনায় তিনি ব্যবহার করেছেন বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। ফলে আপাতদৃষ্টিতে যে চরিত্রগুলি হয়তো খল কিংবা কৌতুকময়, কোনো এক বিশেষ সংলাপে তাদের অন্যতর পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে নাট্যকারের সহানুভূতিকে স্পষ্ট করে। একটি মাত্র সংলাপেই হয়তো চরিত্রের প্রতি পাঠক-দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটে যায়। 'রাজদর্শন' নাটকে যেমন লম্বোদর ভট্ট আগাগোড়া একজন লোভী, পেটুক ব্রাহ্মণ। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই তিনি ব্যস্ত। মালপো খাবার জন্য যে কলার কাঁদি তিনি জমিয়ে রেখেছিলেন, স্ত্রী-সন্তানরা তা আত্মসাৎ করলে তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন ঃ "মাগী বছর বছর বিয়োচ্ছে, আর আমার কপাল থেকে একটি করে সুখাদ্য উঠে যাচ্ছে র‍্যা ...। [সহসা ঊর্ধ্ববাহু হয়ে] নির্বংশ করো ... হে ভগবান নির্বংশ করো ..."[১৮] নিজেকেই নির্বংশ করার এই অভিশাপের আপাত-কৌতুকময়তার গভীরে রয়েছে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের অসহায় আর্তি। এই সংলাপে চরিত্রটির প্রতি পাঠক-দর্শকের যে অনুভূতি জন্মায়, সে সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন ঃ

> "চরিত্রের দ্বান্দ্বিকতার এ ব্যালেন্স বা ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন বলেই মনোজ মিত্রের নাটকে নতুন একটি মাত্রা যোজিত হয়। লম্বোদরের প্রতি তাই বিরাগ জন্মায় না, ঘৃণাও নয়, বরং তার অস্তিত্বের নিষ্ফল উপায়হীনতা আশ্চর্য এক সহানুভূতিকে আকর্ষণ করে আনে।"[১৯]

'নাকছাবিটা' নাটকে যেমন রায়বাহাদুর বরদাপ্রসন্ন সাধারণভাবে স্বার্থপর, ক্ষমতালোলুপ চরিত্র হিসেবেই পরিচিত, যিনি একদা ত্যাজ্য পুত্রকে আবার সাদরে গ্রহণ করতে এসেছেন ভোটে জিতে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার বাসনায়। এই বরদাপ্রসন্ন বিপ্লবী পুত্র বীরেশ্বরকে ত্যাগ করেছিলেন ইংরেজদের খুশি রাখতে। কিন্তু নিজে মুখে যখন তিনি ব্যক্ত করেন নিজের সেই সময়কার অসহায়তার কথা, তখন ক্ষোভের পরিবর্তে তার প্রতি জাগে করুণা ঃ

> "সেদিন আর কী করতে পারতাম বলো। সাহেবদের খুশি না রাখলে সাতপুরুষের জমিদারিটা চলে যেত। যদি বলো জমিদারি রাখাটাই অপরাধ, আমি অপরাধী। কিন্তু অন্তর থেকে বলছি, বীরেশ্বর আমি তোমাকে নিয়ে গর্বও করি, হিংসাও করি ...। দেশের মানুষ তোমাকে ... তোমাদের যে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে — সেকি আমার ভাগ্যে কোনোদিন জুটবে !"[২০]

এই সংলাপ একদা দোর্দন্ডপ্রতাপ জমিদারের অসহায় অবস্থাটি প্রকাশ করেছে। 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' নাটকে পমমামা কমিক চরিত্র। বোনের 'চরিত্র' রক্ষায় তার নজরদারি প্রায় বাতিকের পর্যায়ে পৌঁছেছে। সাংসারিক জগৎ সম্পর্কে প্রায় অনভিজ্ঞ, 'আলপাতালে' এই পমবাবুর দু-একটি মাত্র সংলাপে উন্মোচিত হয়ে যায় চরিত্রটির অন্তরের রিক্ততা ও বিষণ্ণতার দিকটি ঃ

> "কী হচ্ছে কী ? কান্নার কী হল ? অ্যাই লতু ... আরে বাবা, তোর বিয়ে দিতে পারিনি বলে নিজেও যে করেছি, তা তো নয় ... যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। এখন তো কিছু করারও নেই। আর দুজনের জীবন তো কেটেই গেল। (লতিকার মাথায় হাত বোলায়) ভাইবোনে খারাপ যে কাটল তাও তো না।"[২১]

এই সংলাপ কেজো সংসারে ব্যর্থ এক অসহায় মানুষের, নিজেদের অদৃষ্টকে মেনে নেওয়া এক সাধারণ মানুষের। অসহায়তা নিজের মুখে ব্যক্ত হয়েছে বলে চরিত্রটির প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছে এবং নাটক জুড়ে সেই সহানুভূতির সুরটি বজায় থেকেছে। 'সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি'র আরেকটি দৃষ্টান্ত প্রকাশ পেয়েছে পমমামা চরিত্রটির মাধ্যমে। ডিমভরা পাবদা আনতে বাজারে গেছেন পমমামা, কিন্তু ফিরেছেন খালি থলে নিয়ে। বাজারে পাবদা নেই এমন নয়, উর্বশী মাছওয়ালী সেদিন বসেনি বলে খালি হাতে ফিরেছেন তিনি। তার দর্শন ঃ "রোজ যার কাছ থেকে তেলাপিয়া নিই, পাবদাটা আজ তার কাছ থেকে নেব না।"[২২] এই দর্শন আসলে নাট্যকার মনোজ মিত্রের। 'কুহুযামিনী' নাটকে স্বামী চণ্ডীগোপালের বন্ধু আবিরের সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছে জোনাকি। প্রাথমিকভাবে জোনাকির সম্পর্কে যে ধারণা তৈরী হয়, ক্রমে তা ভাঙতে থাকেন মনোজ মিত্র। মানুষকে খাদের কিনারে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করেন তিনি এবং সে পরীক্ষায় মানুষের উত্তরণই দেখান। বাহ্যত গোঁয়ারগোবিন্দ হলেও চণ্ডীগোপাল যে স্ত্রীকে যথেষ্টই ভালোবাসে, তা এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে শুনেছে জোনাকি। আবির যে গাড়িতে তাকে চড়িয়েছে কিংবা যে টাকা তার পেছনে খরচ করেছে, সেগুলি সবই যে চণ্ডীগোপালের, তাও জানা হয়ে গেছে জোনাকির। কিন্তু এসব জানার আগে থেকেই জোনাকির মনের গতি চণ্ডীগোপালের দিকে। হাইওয়েতে আটকে পড়ে তার প্রথমেই মনে হয়েছে, সারাদিন খাটাখাটি করে 'মানুষ'টা ঘরে ফিরবে। এই আস্থা, বিশ্বাসের জগতেই মানুষকে থিতু করতে চান মনোজ মিত্র। চারপাশের বিশ্বাসভঙ্গের মাঝে রচনা করতে চান একখন্ড স্বপ্নস্বর্গ। অর্থসর্বস্ব দুনিয়ায় অর্থের ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে চান স্নেহ-ভালোবাসা-মমতাকে ঃ

" আবির ।। টাকা হাতে পেলেই বাজা! ইচ্ছে হয়, দেখি না বাজিয়ে ... টাকায় কত কী হয়, কত কী কেনা যায় ...

জোনাকি ।। হলো, কেনাবেচা হলো ?

আবির ।। ... অনেক অনেক কিছু কিনলাম, শুধু একটা জিনিস কিনতে পারলাম না। কেনা যায়ও না। ও জোনাকি, তোমায় কেনা যায় না।

জোনাকি ।। দুঃখু হচ্ছে ?

আবির ।। দুঃখ হবে কেন ? কিনতে তো বেরুইনি, দর করতে বেরিয়েছিলাম।... তোমার দরটা অনেক।"[২৩]

আবিরের শেষোক্ত কথাটিতে একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জোনাকির গরিমা, অন্যদিকে তেমনি আবির নিজেও পেয়েছে পাঠক-দর্শকের সহানুভূতি।

'পাখি' একাঙ্কটিতে গোপাল নামে যে চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন তিনি, সেই পরিহিতৈষীর সবসময়ের চিন্তা বুড়োবুড়িদের নিয়ে ঃ "এক একদিন রাতে ঘুম আসে না ... সব বুড়োবুড়ি, কেউ যাদের দেখার নেই, সবার মুখগুলো ভাসে নিতুদা ..."[২৪] এই সহানুভূতি আসলে নাট্যকারের, যা ব্যক্ত হয়েছে চরিত্রমুখে। দেশের বাড়ি থেকে নীতিশের মায়ের চিঠি এসেছে দেখে গোপাল খোলার জন্য পীড়াপীড়ি করলে বিবাহবার্ষিকীর আয়োজনের মাঝে নীতিশ সে চিঠি খুলতে চায় নি। শ্যামা

এবং গোপালের মতো আমরাও তখন নীতিশকে নিষ্ঠুর এবং পাগল বলেই মনে করি। কিন্তু মনোজ মিত্র চরিত্রের ওপর ফেলেন ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি, প্রত্যেককেই সুযোগ দেন নিজের অবস্থানটি বুঝিয়ে বলার। তাই নীতিশের আত্মপক্ষ সমর্থনে বিষয়টি অন্যতর মাত্রা পেয়ে যায় ঃ

> "পাগল, হ্যাঁ আমি পাগল ! ছেলেবেলা থেকে উপোস করে করে আমি পাগল হয়ে গেছি।... মাঘ মাস থেকে মা বলছে দেখতে যেতে, পারি না ... খালি হাতে দেখতে যাবো কি ! মা যে কিছু আশা করে। চিঠি কেন ছিঁড়ে ফেলি!... পাড়ার লোক ধরে ধরে মা পত্তর দেয় । প্রত্যেকটা পত্রে অবস্থা খারাপ ... আরো খারাপ ... আরো! এতে কী লেখা আছে ... কী লেখা থাকতে পারে আমি জানি ... সেই এতটুকু বয়েস থেকে জানি কখন কোন্ চিঠি কোন্ খবর নিয়ে আসে! ভাল খবর কখনো আসে না রে ! সকাল থেকে আজও জানতাম আসছে ... একটা খবর আসছে। ভয় করছিল আমার। তাই হ'লো! আজকের দিনে এটা আমি পড়তে পারব না। একটা দিন ... মাত্তর কয়েক ঘন্টা আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। জীবনে আর কোনদিন কিছু চাইব না।"[২৫]

পাঠক-দর্শক এখানে থমকে দাঁড়ান, দ্বিধান্বিত হয়ে ভাবেন, কোন্‌টা প্রাপ্য নীতিশের — ধিক্কার অথবা সহানুভূতি। সে যেন এখানে দারিদ্র্যের যূপকাষ্ঠে বাঁধা এক অসহায় পশু, যে কিনা দু'টি মুহূর্তের জীবন ভিক্ষা চাইছে, দারিদ্র্যের পীড়নকে ভুলে অন্তত কয়েক ঘন্টা জীবনকে উপভোগ করতে চাইছে। 'কালবিহঙ্গ' নাটকে ত্রিকালজ্ঞ পাখির ধোঁকা দিয়ে মানুষ ঠকায় যে ভক্তরাম, তাকেও শেষপর্যন্ত সহানুভূতিতে উত্তীর্ণ করে দেন মনোজ মিত্র। ভক্তরামেরা আসলে ব্যবহৃত হয় সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষের হাতে। একটা সীমার পর তারাও অসহায়। লোক ঠকাতে ঠকাতে কখন যেন তারা নিজেদেরও ঠকাতে শুরু করে নিজেদের অজ্ঞাতেই। তাই ছেলের কাছে পরীক্ষা দিতে গিয়ে নিজের অজান্তেই সে হাতসাফাই করে ফেলেছে। উপেনের সংলাপে ভক্তরামের এই অসহায় অবস্থাটিকে ফুটিয়ে তুলে নাট্যকার ভক্তরাম চরিত্রের ওপর অন্য দিক থেকে আলো ফেলেছেন, যে আলোতে ভক্তরাম প্রতিভাত হয়েছে ব্যবস্থা এবং অভ্যাসের হাতে বন্দী এক অসহায় মানুষরূপে ঃ "বাবা হয়ে তুমি ছেলের উন্নতি চেয়েছো — এতো বেশি করে চেয়েছো, যে হাত সাফাইটা তোমার নজরেই পড়ছে না"[২৬] 'পরবাস'-এর একাঙ্ক রূপ 'কোথায় যাবো'তে গজমাধব প্রথম থেকেই একটি সিরিও-কমিক চরিত্র। কিন্তু কমেডির চরিত্রের ভেতরে যে অশ্রুর প্রবাহ থাকে তা যখন তুলে ধরেছেন নাট্যকার তখন গজমাধবের জন্য নীরবে দু-ফোঁটা চোখের জল পড়ে পাঠক-দর্শকের। সাধারণের চেয়ে হীনতর গজমাধবের জন্য বুকের কাছে একদলা কষ্ট পাকিয়ে ওঠে। করালী দত্তর ঘর ছেড়ে দিয়ে পথে নামবে গজমাধব, কোথাও যাবার মতো জায়গা তার নেই। কিন্তু তার মনেও তো আছে সাজানো-গোছানো এক সংসারের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকেই যখন সত্যি হিসেবে তুলে ধরে মন্দিরার কাছে, তখন তা যেন নিজেরও এক তৃপ্তির অনুভব ঃ

> "গজ ।। (বিষণ্ণ মুখে) আজ্ঞে হ্যাঁ, খবর টবর সবই দেওয়া আছে। তারা আমার জন্যে রান্নাবান্না করে ... ঘরটর সাজিয়ে গুছিয়ে অপেক্ষা করবে ... এইরকম কথাই আছে... [কথার শেষে গজমাধবের মুখে নীরব হাসি ফুটে ওঠে]
>
> মন্দিরা ।। কোথায় যাচ্ছেন, নিজের বাড়ি ?
>
> গজ ।। (বিষণ্ণ মুখে) আজ্ঞে হ্যাঁ! (বলেই গজমাধব মন্দিরাকে লুকিয়ে নীরবে হাসে) ...

মন্দিরা ।। বাড়িতে কে কে আছেন ?

গজ ।। (দুঃখে নীরবে হাসে) কে কে ... ইয়ে মানে ... সব ... সবাই ...

মন্দিরা ।। বুঝেছি ! আর বলতে হবে না। তিনি ... মানে আপনার উনি আছেন ... কেমন ? (গজমাধব চুপ) দেখতে কেমন ? নিশ্চয়ই আমার থেকেও সুন্দরী ...

গজ ।। (নীরবে ঘাড় নাড়ে) না না, শুধু এই কপালটায় যখন সিঁদুরের টিপ লাগিয়ে ... লালপেড়ে শাড়ি পরে ... প্রদীপ হাতে ... যখন সামনে এসে দাঁড়ায় ... [গজমাধবের অশ্রু হাসি হয়ে যায়]''[২৭]

হাসি আর অশ্রুর মিশেলে গজমাধব এখানে যেন এতক্ষণের পরিচয়ের সীমা ছাড়িয়ে এক অপরিচয়ের জগতে উত্তীর্ণ। 'মহাবিদ্যা' নাটকে নগরের কোতায়াল নিজেই ধাঙড় তুলসীদাসকে অরক্ষিত এক বাড়িতে সিঁদ কাটতে বলছে গৃহবধূর গয়না চুরি করে আনার জন্য। কিন্তু সেই কোতায়ালের প্রতিও বর্ষিত হয়েছে নাট্যকার মনোজ মিত্রের সহানুভূতি। তিনি খুঁজেছেন চরিত্রের অসততার কারণটিকে, সেই কারণের জোরেই কোতোয়াল আর পুরোপুরি খল থাকেনি, হয়ে পড়েছে কিছুটা করুণার পাত্র ঃ

''মেয়েটার বিয়ে দিয়েছি বেশ বড়লোকের ঘরেই। দানসামগ্রী গয়নাগাঁটি খাটপালঙ্ক পণের কড়ি ... কিছুই কম দিই নি। তবু আমার বড়লোক জামাই বেয়াই বেয়ানের মন উঠল না। মেয়েটাকে চিলেকোঠায় আটকে রেখে চাবুক দিয়ে চাবকায়। বলে যা তোর কোতোয়াল বাপের কাছ থেকে আরও গয়না নিয়ে আয়। (থেমে) এক পুঁটলি গয়না ছাড়া মেয়েটাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার করা যাবে না ! (থেমে) গর্ত কাট !''[২৮]

গর্ত কাটতে বলাটা এবার আর ততটা অপরাধ বলে মনে হয় না। একইরকমভাবে 'প্রভাত ফিরে এসো'তে প্রভাত যখন ঝুমুরকে বেঁধে রেখে সমস্ত জিনিস নিয়ে যায় তখনও যে প্রভাতের প্রতি যথেষ্ট বিরূপতা জাগে না তার কারণ, মনোজ মিত্র আগেই আমাদের জানিয়ে দেন, সরল প্রভাতকে সবাই ঠকিয়ে ঠকিয়ে নিঃস্ব করে ছেড়েছে। ঝুমুরও অন্যের বাড়ি থেকে চেয়ে আনা জিনিসে নিজেকে এবং নিজের ঘর সাজিয়েছিল প্রভাতকে ফাঁদে ফেলে টাকা আদায় করবে বলে। আবার ঝুমুরের প্রতিও বিরূপতা জাগতে পারে না, কারণ ঝুমুরের টাকাটা প্রয়োজন স্বামী সৌম্যর পেসমেকারটা বদল করার জন্য। ঠিক যেমন 'দম্পতি' নাটকে দোলন ব্ল্যাকমেল করে শ্যামলকে, নিজের স্বামী সুদীপকে বাঁচানোর কারণটি তার পেছনে জুড়ে দিয়ে দোলনকে পাঠকের বিরূপতা থেকে বাঁচান মনোজ মিত্র। এভাবেই তাঁর সহানুভূতি-ধন্য হয়েছে যে কোনো ধরণের চরিত্র। আসলে মানুষের প্রতি রূঢ় হতে পারেন না তিনি। মনে করেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা বিপন্নতা আছে, সেই বিপন্নতাই তাকে অসহায় করে। সহৃদয় মন নিয়ে তিনি খুঁজেছেন সেই বিপন্নতার কারণটিকে।

এই সহৃদয়তাই তাঁকে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে, যা কিছুই ঘটুক না কেন, মানুষ মূলত ভালো। তাঁর অনেকগুলি নাটকই তাই শেষ হয়েছে মনুষ্যত্ব এবং শুভবোধের জাগরণে। এই শুভবোধের জাগরণ ঘটানো এবং তাকে সমাজ-সংসারে লালন করাই নাট্যকার মনোজ মিত্রের জীবনবোধ। 'অশ্বত্থামা' নাটকের শেষে সাফল্য-লোলুপ, রক্তপিয়াসী অশ্বত্থামা অনুতপ্ত। রক্ত দেখে দেখে, ধ্বংস করতে করতে সে ক্লান্ত। তাই বৃহৎ এক সৃজনের বাসনায় সে অস্থির। ধরিত্রীর তৃণমূলে তখন সে জল

সিঞ্চন করতে চায়। পঞ্চপান্ডবের পরিবর্তে ভুল করে তাদের পাঁচ সন্তানকে হত্যা করে ফেলার পর জেগেছে অশ্বত্থামার শুভচেতনা। দুর্যোধনকে সে চিনেছে 'দুরাচার রাজা' রূপে। নিজেকে চিনেছে ব্যবহৃত এক অস্ত্ররূপে, যে অস্ত্র বারবার আঘাত হেনেছে ভ্রান্ত লক্ষ্যে। কিন্তু রাজার পালিত ঘাতকের সাধ্য কী মহান ধর্মকে চূর্ণ করার! অধর্মের বিনাশে যুগে যুগে মৃত্যুর নাগপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসে সনাতন ধর্ম। পান্ডবরা তাই অক্ষত। ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে রথ। সেই রথের আরোহীর হাতেই নাশ হবে ঘাতক বাহিনী। কৃপাচার্যের সংলাপে তারই ইঙ্গিত ঃ "ঐ কপিধ্বজ রথে দ্যাখো গান্ডীবধারী অর্জুন ! নাশ করবে ... নাশ করবে এই ভ্রষ্ট যোদ্ধাদের ! মহাকালের বিচার ! মুক্তি নেই ... আমাদের মুক্তি নেই ..."[২৯] সমকালীন রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলাকে মহাভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রতিফলিত করেও মনোজ মিত্র আস্থা স্থাপন করেছেন সেই শুভ শক্তির আবির্ভাবে, যা বিনাশ করবে সব অন্ধকার। 'চাক ভাঙা মধু' বা 'সাজানো বাগান' নাটকে শুভবোধের জাগরণ ঘটেছে শেষে নতুন জীবনের সম্ভাবনায়। বাদামী নিরুপায় আক্রোশে সড়কি চালিয়ে অঘোর ঘোষের বক্ষ ফাটিয়ে দেবার পর টালমাটাল পায়ে উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে গেছে দোলনার দিকে — নতুন জীবনের দিকে। মনোজ মিত্র মানুষকে এভাবেই এগিয়ে দেন ইতিবাচকতার দিকে, জীবনের সদর্থক অনুভবের দিকে। 'সাজানো বাগান' -এ শেষে নবজাত শিশুর কান্না শুনে ফলিডলের শিশি ফেলে দিয়ে বাঞ্ছার যে সংলাপ তা জীবনের সদর্থকতাকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। মৃত্যুর প্রতীক ফলিডল ফেলে দিয়ে বাঞ্ছারাম এগিয়ে গেছে সেই ঘরের দরজার দিকে, যেখানে নবজাত সন্তান এসেছে — নতুন জীবন এসেছে। সেই শিশুকে উদ্দেশ্য করে বাঞ্ছার সংলাপ পুরোটাই জীবনের আহ্বান। প্রকৃতির মতো সহজ সে জীবন নবজাত শিশুকে দিয়ে যাবার অঙ্গীকার করেছে বাঞ্ছা। এই উত্তরাধিকারীর জন্যই তো বাগান সাজায়, জীবন সাজায় মানুষ। শুভবোধের জাগরণে মনোজ মিত্র প্রচলিত বাংলা নাটকের মতো বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতবাদ বা তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেন না। তিনি মনে করেন, তত্ত্বের চেয়ে জীবন বড়ো, মানুষ বড়ো। 'শিবের অসাধ্য' নাটকে জোতদারের হাত থেকে কৃষকের মুক্তির উপায় হিসেবে মানুষের চৈতন্যের জাগরণের ওপরই ভরসা রেখেছেন নাট্যকার। বাইরে থেকে আসা কোনো নেতা বা আরোপিত কোনো তত্ত্ব তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না, 'পরের কাছা' ধার করে পার পাওয়া যাবে না, চাষার ভাগ্য চাষা ছাড়া কেউ ফেরাতে পারবে না ঃ

"দুর্গা ।। মানুষের কাজ মানুষই করবে। মানুষের শত্রুকে মানুষই মারবে। মানুষের বুকে তুমি চৈতন্য জাগিয়েছ, এবার তাদের ভালো মন্দ তারাই বেছে নিক ... তাদের পথ তারা খুঁজে নিক। সেটাই হবে সব থেকে সুন্দর, সব থেকে মঙ্গলকর ...

শিব ।। তবে তাই হোক্ ! লেগে পড় ... ও ছিদেম, লেগে পড় ! পারবি পারবি ... পারলে তোরাই পারবি ! কিছু করতে হলে তোদেরই করতে হবে। লেগে পড় ! উল্টেপাল্টে দে । আসছে বছর আমরা এসে যেন দেখতে পাই, ও ছিদেম, ভবের অসুর নাশ হয়েছে, তোরা জয়ী হয়েছিস ... পৃথিবী সুন্দর হয়েছে, মধুর হয়েছে ... আসছে বছর আমরা তোদের ঘরে উঠব ... ও ছিদেম, আমরা তোদের ঘরে উঠব ..."[৩০]

এই একই চেতনার উন্মেষের কথা আছে 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে। রাক্ষসনিধনের ব্রহ্মাস্ত্র হিসেবে সেখানে মানুষের শুদ্ধ চৈতন্যকেই স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে ঃ "মানুষ ! নির্লোভ নিষ্পাপ অভ্রান্ত মানুষ ... শুদ্ধ জাগ্রত মানুষ তার মহাকাল !"[৩১] পৃথিবীতে কোনো মানুষই মহান পবিত্র হয়ে ভূমিষ্ঠ হয় না, বারবার অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সবকিছু তাকে অর্জন করতে হয়। অনুতাপদগ্ধ এই শুদ্ধ মানুষেই মনোজ মিত্রের আস্থা। নীলকমল, সুবর্ণ আর হীরামন অর্জন করে সেই চেতনা, তাই তাদের অস্ত্রাঘাতেই রাক্ষসের নিপাত ঘটে। 'নৈশভোজ' নাটকেও 'সাধু' তুষ্টুর চৈতন্যের উদ্বোধনের মধ্যে নাটক শেষ করেছেন মনোজ মিত্র। মাথায় জট পড়তে দেখে তুষ্টু সংসার ভুলে ধর্মে মেতেছিল কিন্তু শকুনের নখরে জটা ছিন্ন হতে সে ভারমুক্ত হয়েছে, সেই সঙ্গে শকুনের ব্যবহারে শিখেছে, সন্তানকে বুক দিয়ে আগলে রাখাই সবচেয়ে বড়ো ধর্ম। আত্মধিক্কারের মধ্যে তুষ্টুর যে নতুন চেতনার উন্মেষ, সেই চেতনাকে অভিনন্দিত করেন মনোজ মিত্র।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোথায় যেন মনোজ মিত্রের ভাবনার আত্মীয়তা। তারাশঙ্করের মতোই তিনি জানেন, পুরনোর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, তবু তাঁর সহানুভূতি এবং দীর্ঘশ্বাস সেই পুরনোরই জন্য। এই 'পুরনো' আসলের মানুষের চিরকালীন মূল্যচেতনা। কালের গতি ফেরাতে পারেন না তিনি, কিন্তু বিলীয়মান কালের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল বা একটু দীর্ঘশ্বাস জেগে থাকে তাঁর রচনায়। সেই ছোটোবেলায় ধূলিহরে ছেড়ে এসেছিলেন যে সহজ শিথিল জীবন, সেই জীবনের প্রতি ভালোবাসা বজায় রেখেছেন সবসময়। বিশেষত, আধুনিক সময়ের সঙ্গে তুলনায় নানাভাবে নানা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে সেই শিথিল জীবনচর্যার কথা। 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে যেমন জটা নিজেদের পেশার পড়ন্ত অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সহজভাবে কটাক্ষ করেছে আধুনিক মানুষের ধূর্ততাকে ঃ

> "ইমন আকাল ... আজকাল এট্টা লোকেরেও সাপে কাটে না। (দাক্ষার চোখে ত্রাস) কাটবে কেনে? মুনিষ্যি অজকাল সব না খেয়েই অক্কা পাচ্ছে ... সাপ পজ্জন্ত আর গে পৌঁছয় না। হাঁ, সে আগের আমলে ছিলো ... ছিলো সব কাছাখোলা হালা-পাগলা লেতাই-গৌর মুনিষ ... কুমোর পাড়ায় এট্টা মাগী ছিলো, বুঝলিরে মাতলা, বেয়াল্লি বছরে তারে সাপে ছুঁয়েছে এককুড়ি ছ-বার।"[৩২]

'কাছাখোলা হালা-পাগলা লেতাই-গৌর মুনিষ' যে একালের সংসারে অচল, মনোজ মিত্র তা জানেন না এমন নয়, তবু তাঁর অন্তরের সহানুভূতি যে সেই মানুষের প্রতিই, তা গোপন থাকে না। 'শোভাযাত্রা' নাটকে মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার এমন এক উত্তরপুরুষকে, যিনি পূর্বপুরুষের কৃতকর্মের দায় বহন করে চলেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই মনোজ মিত্রের সহানুভূতি এখানে বিলীয়মান সামন্ততন্ত্রের প্রতি। কেউ কেউ এই সহানুভূতিকে দুর্বলতা বলে সমালোচনা করেছেন ঃ

> "শ্রীমিত্র সামন্ত সমাজ আর পুরনো অতীতের প্রতি একটু বেশি দুর্বলতা দেখিয়েছেন। সভ্যতার অনিবার্য বিবর্তনে সামন্ত সমাজ ও সভ্যতা একদিন অতীত হয়ে যায়। সভ্যতার অগ্রগতির সমুখে যে সমাজের উপস্থিতি বাধা হয়ে দাঁড়ায়; সেই সমাজ তো অতীত হবেই। তাকে নিয়ে টানাপোড়েন আর হা-হুতাশ বেশীরভাগ সময়েই শূন্যগর্ভ কোনো আবেগের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কোনো মাত্রা পায় না।"[৩৩]

রাজনৈতিক বা সামাজিক তত্ত্বের দিক থেকে এই সহানুভূতি 'শূন্যগর্ভ আবেগ' মনে হতে পারে, কিন্তু মনোজ মিত্র জীবনকে তত্ত্বের ছাঁচে ফেলে দেখেন না। তত্ত্ব-অতিক্রমী বা তত্ত্ব-নিরপেক্ষ যে আলো-

ছায়া খেলা করে মানুষের জীবনে, তাকেই তুলে ধরেন নিজের সৃষ্টিতে, তাই তাঁর কাছে বড় হয়ে ওঠে সিনেমার শুটিং-এ মহিষাদলে গিয়ে সেখানকার রাজার দেওয়ানবাড়িতে দেওয়ানের বংশধরের স্ত্রী-র মুখের কথা। ভাঙাচোরা সেই বাড়িতে তাঁরা বাস করছেন, বয়ে বেড়াচ্ছেন জগন্নাথের রথ। উৎসব আর হয় না, কিন্তু রথটি ফেলতেও পারেন না, বেচতেও পারেন না। সেই ভদ্রমহিলার মুখেই শুনেছিলেন, তাঁদের প্রতি গ্রামের লোকজনের বিরূপ মনোভাবের কথা। পূর্বপুরুষের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছেন তাঁরা, নীরবে সব গঞ্জনা সহ্য করে। মনোজ মিত্রের সহানুভূতিশীল মন অনুভব করেছে এই মানুষগুলির অসহায়তা, যারা প্রত্যক্ষ কোনো অপরাধ না করেও পূর্বপুরুষের অপরাধের বোঝায় পীড়িত এবং লজ্জিত। এই সহানুভূতি মানবের প্রতি, মানবতার প্রতি। এই নাটকে মনোজ মিত্র বাংলাদেশের গ্রামীণ উৎসবের ছবি এঁকেছেন। দুর্গোৎসব উপলক্ষে নিজেদের গ্রাম ধূলিহরে বাড়ির চন্ডীমন্ডপের সামনের উঠোনের যে মেলার স্মৃতি রয়ে গেছে, তাকেই রূপ দিয়েছেন এখানে। এই উৎসবের মেলায় হিন্দু-মুসলমানের কোনো ভেদ ছিলনা। সকলেই অপেক্ষা করে থাকত বছরের ঐ কটা দিনের জন্য। নাটকেও অতসী-এন্তাজের কথোপকথনে সেরকম সম্প্রীতির সুরই ফুটেছে। এই সম্প্রীতি আরোপিত বা চেষ্টাকৃত নয়, এ জীবনের স্বাভাবিকতার মতোই সহজ ঃ

> "অতসী ।। গাঁয়ে এই একটাই যা বড় উৎসব ... সেটাও যদি বন্ধ হয়ে যায় ! বলো, লোকে কত আনন্দ করে
>
> এন্তাজ ।। হুঁ হুঁ পুরো সাতদিনের মেলা ! সাতটা দিন নিমতিতের কারো ঘরে হাঁড়ি চড়ে না গো ! ছেলে মেয়ে বৌ ঝি সব তো মেলায়, চরকি ঘুরছে ! আমার বুড়ি তো সারা জষ্টিমাস আম ছোঁয় না। ঐ বসে থাকে, কবে আষাঢ়ের মেলায় ফজলি উঠবে ..."[৩৪]

ধূলিহরের আশ্বিনের মেলা এভাবেই 'শোভাযাত্রা'য় হয়ে ওঠে আষাঢ়ের মেলা। আধুনিক তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই ছবি সমালোচিত হয়েছে। 'বাংলার সংগ্রামী চাষীদের নিয়ে এ এক ছেলেভোলানো রূপকথা' এবং 'বিলুপ্ত ফিউডাল প্রথায় অনুগত দাস মনোভাবাপন্ন চাষিদের জীবন-জঞ্জাল' বলে যাঁরা এর সমালোচনা করেছেন, তাঁদের প্রতি মনোজ মিত্রের বক্তব্যঃ " শুধু কেতাবী তত্ত্ব দিয়ে জীবনটাকে ব্যাখ্যা না করে, জীবনের জঞ্জাল দিয়ে তত্ত্বটাকে পরিপুষ্ট করুন। রূপবান তত্ত্বকথায় জীবনের সবটুকু রূপ ধরা পড়ে কি ?"[৩৫] আধুনিক জীবন থেকে এই আন্তরিকতাপূর্ণ উৎসব ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলে মনোজ মিত্রের ক্ষোভ চাপা থাকে না ঃ

> "এখন প্যান্ডেল আর আলোকসজ্জা আর বিসর্জনের শোভাযাত্রা আর একাদশীয় জলসাতেই বরাদ্দের নব্বুইভাগ চলে যায়। এখন বারোয়ারি পুজোয় আয়োজকরা কিচেনে তালাচাবি লাগিয়ে পুজোর পাঁচদিন প্যান্ডেলে বসে ফ্রায়েড রাইস-টাইস খান। এই ব্যবস্থাই ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। ... ঘরের দোরের সে বাজারের মর্ম এই শহরের মানুষ বুঝতে পারবেন না।"[৩৬]

আসলে মানসিকভাবে মনোজ মিত্র স্বস্তি পান সেই জগতে, যেখানে ছিল জীবনের একটা মূল্যযুক্ত রূপ। সেই রূপ নষ্ট হয়ে গেছে বলেই নিজের রচনায় তাকে ফিরিয়ে আনবার ইচ্ছা। নতুনের মধ্যে সেই মূল্য নেই, পুরনোর মধ্যেও সেই মূল্যকে নেব না – সেই শূন্যতার মধ্যে নাট্যকার যেতে চান না। তাই নিজের সৃষ্টিতে সে জগৎ রক্ষা করা বা ফিরিয়ে আনায় তার সর্বতো প্রয়াস।

সেই কারণেই দেশজ পুরনো নাট্যকলার প্রতিও তাঁর গভীর মমতা। সেই নাট্যকলা বিস্মৃত হয়ে বাংলা থিয়েটারে কেবল বিদেশি নাট্যকলার প্রতিধ্বনি দেখে তিনি আহত হয়েছেন, আক্ষেপ করেছেন। বিদেশি নাটকের অনুবাদ বা বিদেশি নাট্যশৈলীর অনুকরণের বিরোধী তিনি নন, কিন্তু সেই জোয়ারে দেশীয় নাট্যকলার ভেসে যাওয়া তিনি সমর্থন করতে পারেন নি ঃ

> "অতিরিক্ত বিদেশমুখিনতায় একটা অত্যন্ত জরুরি কাজ আমরা অবহেলা করেছি। দেশের মাটিতে ছড়িয়ে থাকা দেশজ নাট্যকলার পুনরুদ্ধার সাধন করিনি, তার বিবর্ধনে সচেষ্ট হইনি। তার মৌলশিক্ষা গ্রহণ করে তাকে আমাদের নবনাট্যের বার্তাবহ করে তুলিনি"[৩৭]

নিজের প্রতিটি সৃষ্টিরই উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন দেশজ মৃত্তিকা থেকে এবং 'কিনু কাহারের থেটার'-এর মতো একাধিক সৃষ্টিতে পুরনো নাট্যকলার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন। রোমান্টিকদের মতোই রূঢ় বাস্তবতা এড়াতে মনোজ মিত্র আশ্রয় নিতে চেয়েছেন অতীতের প্রেক্ষাপটে। সেখানেই খুঁজে পেয়েছেন স্বস্তি ও শান্তি। 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটকে সেই অতীতকেই তুলে এনেছেন তিনি। আধুনিক সমাজে যখন মানুষের কুশল জিজ্ঞাসা করার লোক ক্রমশ কমে আসছে, তখন তিনি উপস্থাপিত করলেন হেকিমকে, যিনি যেচে রোগীর কাছে গিয়ে চিকিৎসা করেন, পথে পথে হেঁকে বেড়ান 'দাওয়াই চাই গো - দাওয়াই'। হেকিম যেন গ্রামবাংলার সেই হারিয়ে যাওয়া ইষ্টকুটুম পাখি – যে প্রতিনিয়ত গৃহস্থের ভালো থাকা নিয়ে চিন্তা করে। মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতায় ব্যথিত মনোজ মিত্র একজন ভালো মানুষের গল্প বলার মধ্য দিয়ে যেন বাংলাদেশের এক সময়ের আন্তরিক পরিবেশটিকেই স্মরণ করতে চেয়েছেন। নাট্যকারের বুকে যে দরদ রয়েছে মানুষের জন্য, সেই দরদই তিনি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন হেকিমের মধ্যে। সমাজদেহে যখন গভীর ক্ষত, মানবমনে যখন তীব্র ব্যথা, তখন হেকিম এলেন 'ব্যথা সারাই'-এর বার্তা নিয়ে। একইসঙ্গে পলাশপুর এবং দরিয়াগঞ্জের সাধারণ মানুষের জন্য কাঁদে হেকিমের হৃদয়। মনোজ মিত্র দেখাতে চান, হিন্দু বা মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেই মন্দির বা মসজিদের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুধার অন্ন এবং সাধারণ রোগের ন্যূনতম চিকিৎসা। যাঁরা এই ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর কথা বলে, তাঁরাই লাঞ্ছিত, প্রহৃত হয় – হেকিমের মতো।

বৃদ্ধ চরিত্রের প্রতি মনোজ মিত্রের সহানুভূতি একাধিক নাটকে লক্ষণীয়। আশৈশব নিজের রোগগ্রস্ত ঠাকুর্দাকে দেখা থেকেই সম্ভবত এই সহানুভূতির উৎসার। সেখান থেকেই মনে ভয় — নিজে যখন বুড়ো হব তখন কি হবে ! এই ভাবনাই তাঁকে প্রণোদিত করেছে চরিত্র হিসেবে বৃদ্ধদের তুলে আনতে। লক্ষণীয়, এই বৃদ্ধরা সমাজে বা পরিবারে খুব বিশেষ কেউ নয়, সংসারে তাদের অবস্থানও খুব পোক্ত নয়। অথচ তাঁরা জীবনকে ভালোবাসে। সেই ভালোবাসাটুকুকে সম্মান করেন, শ্রদ্ধা করেন মনোজ মিত্র। 'মৃত্যুর চোখে জল' নাটকে বঙ্কিম নামে যে বৃদ্ধকে এঁকেছেন মনোজ মিত্র, তার পেছনে যে রয়েছেন তাঁর ঠার্কুদা, সেকথা একাধিক লেখায় তিনি জানিয়েছেন। চোখের সামনে দীর্ঘদিন দেখেছেন রোগশয্যায় শায়িত বৃদ্ধের জীবনের জন্য আকুলতা ঃ

> "একটানা দীর্ঘকাল দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যশায়ী অন্নদাচরণের দিবসরজনী কেটেছে রোগচিন্তায়। স্বীয় প্রাণটুকু ছাড়া শেষ দিকে আর কিছু চিনতেন না ঠাকুর্দা। বেঁচে থাকার প্রাণান্ত লড়াই প্রথম দেখি ঠাকুর্দাদার মধ্যে।"[৩৮]

এই লড়াই-ই করেছে বঙ্কিম। নিজেকে প্রাসঙ্গিক ভেবে, গুরুত্বপূর্ণ ভেবে তৃপ্তি পেতে চেয়েছে। তাকে কি স্বার্থপর মনে হবে ! মনোজ মিত্রের নাট্যবয়ন-কৌশলের সূত্রে তা মনে হয় না, বরং একধরণের করুণাবোধ জাগে। বাড়ির ওপর ডাক্তারকে পেয়ে তিনি নিজেকে একবার দেখিয়ে নিতে চান, নিজের কাছে সব-সময়ের জন্য একজন লোক চান, খোকার জন্য ডাবের জল, লেবুর রস, মুসুম্বির রস আনা হচ্ছে শুনে লুব্ধ হন। এক শিশুর মরণ-বাঁচন সমস্যার মাঝে তার এইসব আচরণ সকলের বিরক্তি উদ্রেক করলেও মনোজ মিত্র বৃদ্ধেরই প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করার ফলে চরিত্রটি পাঠক-দর্শকের সহানুভূতি পেয়ে গেছে। এই নাটকে মনোজ মিত্রের আরো একটি কৃতিত্ব নীহার চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণে। বাহ্যত নীহারও বঙ্কিমের প্রতি বিরক্ত অন্য সকলের মতোই। কিন্তু সংলাপের সামান্য দু-একটি মোচড় কিংবা নীরব দু-একটি নাট্যক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তার অসহায়তা এবং সহানুভূতি ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। বঙ্কিমের মতোই জীবনপিপাসু জটা ('চাক ভাঙা মধু'), কেনারাম ('কেনারাম বেচারাম'), গজমাধব ('পরবাস') বা বাঞ্ছারাম ('সাজানো বাগান')। এরা সকলেই বাঁচতে চায় — সব প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে, অবহেলাকে তুচ্ছ করে বা সহ্য করে সংসারলগ্ন থাকতে চায়। জটা যে অঘোর ঘোষকে বাঁচাবার ভাণ করে কৌশলে টাকা খিঁচে নিতে পরামর্শ দেয় মাতলাকে — সে তার জীবনপিপাসারই এক রূপ। হাতে টাকা পেয়ে সে গানবাজনার আসরে মৌজ করতে যেতে চায়। তার জীবনপিপাসা তারই মাপে। কেনারামেরও চাহিদা সামান্যই। রেললাইনে গলা দিতে গিয়েছিল সে, সেখান থেকে ধরে এনে নগেন পাঁজা তাকে 'ফিট' করেছে বেচারামবাবুর শূন্যস্থানে। ভরপুর সংসার দেখে লোভ জেগেছে কেনারামের ঃ ''পারবে, পারবে নগেন, এই সব আমার করে দিতে পারবে ? ''[৩৯] এটুকুই তো চায় কেনারামের মতো মানুষেরা, বেচারামের মতো মানুষেরা। সংসারে সবাই একটু যত্ন-আত্তি করবে, প্রয়োজনের জিনিসটি এগিয়ে দেবে। মনোজ মিত্র হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেন এবং নাটকে রূপায়িত করেন বৃদ্ধদের এই জীবনাসক্তি। 'সাজানো বাগান'-এ নকড়ি বাগানের লোভে বাঞ্ছার সঙ্গে মাসকিস্তি বন্দোবস্ত করে। তার প্রবল আশা — বাঞ্ছা দু-এক কিস্তির পর আর বাঁচবে না। তাই নকড়ি আর মোক্তার বাঞ্ছার বাঁচার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হাসাহাসি করে, কিন্তু 'বোকা বাঞ্ছারাম' প্রবল বাসনায় বিড়বিড় করে ঃ ''বাঁচবো ... আমি বাঁচবো ...''[৪০] মনোজ মিত্র শিল্পিত ইঙ্গিত দেন, শোষকের কৌশলই হয়ে উঠতে চলেছে শোষিতের জীবনের রসদ। সেই ইঙ্গিতই ফলবতী হয়। পদ্ম, গুপি আর চোর মিলে বাঞ্ছার জীবনপিপাসাকে বাড়িয়ে তোলে। নকড়ির পরিকল্পনা মাঠে মারা পড়ে। মঞ্চনির্দেশে মনোজ মিত্র লেখেন ঃ ''পদ্ম বাঞ্ছার হাতে জল ঢেলে দেয়। তৃষিত বাঞ্ছা একে একে গুপি, চোর ও পদ্মের মুখের দিকে চেয়ে চক্‌চক্ করে জল খায়।''[৪১] বাঞ্ছার এই জল খাওয়া যেন জীবনেরই রসদ আহরণ।

প্রকৃতির প্রতি, মাটির প্রতি মনোজ মিত্রের টান গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে তাঁর বেড়ে ওঠার পরিবেশ। জলজঙ্গলের দেশ খুলনায় তিনি ছোটোবেলায় পেয়েছেন প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্য। আবার ময়মনসিংহে দেখেছেন প্রকৃতির অন্যতর রূপ। বাবার চাকরির সূত্রে ময়মনসিংহ জেলার ঘাটাইল ও কালিহাতি-তে তাঁরা থেকেছেন পালা করে। এর মধ্যে ঘাটাইলের প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন মনোজ মিত্র ঃ '' ঘাটাইলে বাসার সামনে দিগন্ত বিস্তৃত ধান খেত। দিগন্তে গারো পাহাড়ের চুড়ো। মেঘ এলে, বৃষ্টি এলে ছবিটা অপূর্ব হয়ে উঠত।''[৪২] ছোটোবেলার সেই প্রকৃতিকে ভালো লাগার, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার ছবি মনোজ মিত্র তাঁর একাধিক নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে।

'সাজানো বাগান' নাটকে যে বাগানের কথা বলেছেন মনোজ মিত্র, সে বাগান কিংবা বাঞ্ছারাম তাঁর কল্পনাপ্রসূত নয়। ধূলিহর গ্রামে বেত্রবতী নদীর কূলে কাপালিপাড়ায় তিনি দেখেছিলেন চাষী বাঞ্ছা বুড়োকে। সেই বুড়োর ছিল পান-সুপুরির বাগান। 'সাজানো বাগান'-এ বাঞ্ছা কাপালিকে রেখেছেন, কিন্তু তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে বাগানে, সে বাগানটি সেই গ্রামের মিত্র পরিবারের। সেই বাগানের বর্ণনা দিয়েছেন মনোজ মিত্র ঃ" বিদেশ-বিভুঁয়ে ফেলে আসা সেই গ্রামটির কথা ভাবলে আম-জাম-চালতা-সুপারি-নারকেল ঘেরা একখানা সাজানো বাগান চোখের উপর ভেসে ওঠে। বাগানের মাথায় শরতের ঝকঝকে আকাশ।"[৪৩] নাটকে এই বাগানের প্রতি বাঞ্ছার যে টান তা নাট্যকারেরই ভালোবাসা। গুপি পদ্মকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে দা-মশায়ের কাছে। বাগান-গাছ-পুকুর দেখে পদ্ম মুগ্ধ। পদ্মর দৃষ্টিতে গুপিও যেন নতুন করে দেখছে সবকিছু। উড়নচন্ডী গুপি পদ্মকে পেয়ে থিতু হতে চাইছে। নিজের সম্পর্কে সে বলেছে ঃ "পদ্মরাণীকে পাবার পর, গুপি জায়গা জমি চিনছে, মাটির মর্ম বুঝতে পারছে।"[৪৪] মনোজ মিত্র দেখাতে চেয়েছেন, নারী চেনায় শেকড়, নারী চেনায় মাটি। এই শেকড় এবং মাটির কাছেই মানুষকে ফেরাতে চান তিনি। তাঁর বাঞ্ছা তাই চলে মাটি ঘষ্‌টে, উপমা ব্যবহার করে গাছ-মাটি-কেন্দ্রিক। নারীর মতোই মমতাময়ী, স্নেহশীলা করে তিনি উপস্থাপিত করেন প্রকৃতিকে। তাই পদ্ম গ্রাম ছেড়ে না যাবার কারণ হিসেবে প্রকৃতির সাহচর্যের কথাই উল্লেখ করে ঃ "এমন গাছপালা ... ফাঁকা উঠোন ... দীঘির জল ... বাতাস ... এ ছেড়ে আমি যাবোই না !"[৪৫] নারী আর প্রকৃতি এখানে একাকার — উভয়েই স্নিগ্ধ, স্নেহশীলা, আশ্রয়দাত্রী। পদ্ম কারখানার মজুরের মেয়ে, নাগরিকতার কুটিল ও কুশ্রী অনুষঙ্গ জড়িত ছিল তার জীবনে। সেই পদ্ম গ্রামে এসে পেয়েছে মাটির স্পর্শ। মনোজ মিত্র এখানে শহর-গ্রামের বৈপরীত্যকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। যে গুপি বাগান বেচে সেলুন, দর্জির দোকান বা ভাটিখানা করতে চেয়েছিল, পদ্মর দৃষ্টিতে সে আবিষ্কার করেছে মাটির সৌন্দর্য। বিশিষ্ট সমালোচক এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "'খ্যাঁচ-খ্যাঁচ-খ্যাঁচ-খ্যাঁচ', 'ঘর্‌ঘর্‌ ঘর্‌ঘর্‌' বা 'চোঁ-ও-ও'র মতো ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারে হয়তো সচতেনভাবেই শান্ত নিরিবিলি বাগানের বিপরীতে একটা শহুরে কোলাহলের অনুষঙ্গ তৈরী করতে চাওয়া হয়।"[৪৬] গ্রাম এবং শহরের এই টানাপোড়েনে গুপির মধ্যে শেষপর্যন্ত জয়ী হয় গ্রামের টান, মাটির টান। 'দর্পণে শরৎশশী' নাটকে কপোতাক্ষ তীরের অসংখ্য ছবি এঁকেছেন মনোজ মিত্র। পাঁচক্ষীরা নামটি সাতক্ষীরা মহকুমার সাদৃশ্যে গৃহীত বলেই মনে হয়। পাঁচক্ষীরায় আসার মধ্যে মনোরমা-শরৎশশী পার হয়েছে গঙ্গা, ইছেমতী, ভৈরব, কপোতাক্ষ। এইসব নদীর গন্ধ লেগে আছে নাটকে। আছে শরৎশশী বা হাসুর গ্রাম মেহেরপুরের কথা, সেই গ্রামের চড়কের সঙের কথা । টুকরো টুকরো ছবিতে বাংলাদেশের গ্রামসমাজ ও প্রকৃতি উদ্ভাসিত এই নাটকে। বিজয়াদশমীর দিন বেরিয়েছে মনোরমা-শরৎশশী। ঘাটে ঘাটে দুর্গা বিসর্জন দেখে শরৎশশীর মনে হয়েছে, দুর্গা যেন তার বুকের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের এক চিরন্তন যন্ত্রণা ও বিষাদবোধকে এই নাটকে মূর্ত করে রেখেছেন মনোজ মিত্র। কপোতাক্ষ নদের তীরে শরৎপ্রকৃতিকে ছোটোবেলায় যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেভাবেই তুলে ধরেছেন এই নাটকে। ছোটোবেলার সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন তিনি ঃ

> "কপোতাক্ষর দুকূলে ঠাসা আম জাম তাল সুপুরি বাবলা শিমূল যজ্ঞিডুমুর আর কাশবন বেলাশেষের লালহলুদে মাখামাখি। সেবার বিজয়াদশমীতে নৌকোয় বসে কপোতাক্ষ নদীর বুকে বিসর্জন দেখেছিলাম। মেজোকাকিমার পিত্রালয় থেকে আমরা ফিরছিলাম আমাদের বেতনা তীরের গাঁয়ে।"[৪৭]

জীবনের অধিকাংশ সময় নগরে বাস করেও মনোজ মিত্র অন্তরে লালন করেছেন সেই ছোটোবেলার নদী-প্রকৃতি-সম্বলিত গ্রামজীবনকে। ষষ্ঠীর ভোরে শ্যামবাজার আর গড়িয়াহাটের মোড়ে বাজা ঢাকঢোল যখন তাঁর কানে 'বুলেটের মতো ফাটে' তখন তিনি স্মরণ করেন 'পুববাংলার নাব্য অঞ্চলে জলজঙ্গলে'র বাজনা, যে বাজনা ঃ "এমন ঝাঁঝালো ছিল না। তার মিঠে বোলে ছিল শ্যামল মেদুরতা।"[৪৮] সেই শ্যামল মেদুরতারই বিস্তার 'দর্পণে শরৎশশী' নাটকে। গ্রামবাংলার স্নিগ্ধতা, শীতলতা যেন ছায়া বিস্তার করে আছে এই নাটকে। এ যেন নাট্যকারের শিকড়-সন্ধান। স্বস্তির আশায়, শীতলতার আশায় ব্যাকুল অতীত-দর্শন। প্রকৃতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা এত গভীর যে, সমস্ত ব্যাধির প্রতিষেধক প্রকৃতিতেই আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেছেন। 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটকে হেকিমের মুখে তিনি বলিয়েছেন ঃ

> "বাঈ সাহেবা সব রোগেরই প্রতিবিধান আছে এই দুনিয়ায়। তামাম দুনিয়ার হিম্মতের চেয়ে একটি ব্যাধির দবদবা কখনো বেশি হতে পারে না বাঈ। এই সবুজ গাছপালা মেঘ জোছনা মিঠে পানি মিঠে হাওয়ার চেয়ে কটি বীজাণুর তাকৎ বেশি, এ কখনো হয় ?"[৪৯]

এ কেবল কথার কথা নয়, গভীর বিশ্বাসবোধ থেকে উচ্চারণ। হেকিমের ওষুধে সঞ্চারিত হয় প্রকৃতির শক্তি, তবেই তো সে দাওয়াই হয় বলবতী ঃ

> "রাতভোর একটানা জোছনা খাবে, শীতল বাতাস খাবে ... হেকিমের দাওয়াই ফুলের সুরভি খায়, ফজরের নেহের খায় ... মধু খায়, মৃগনাভি খায়, বনের সবুজ খায় ... অনেক ক্ষুধা তার। আসমানের দিগন্তজোড়া কালো মেঘে বিদ্যুতের ঝলকানি উঠলে, সেই ঝলকানিটিও খায়।"[৫০]

মনোজ মিত্র নিজে বিশ্বাস করেন, সমস্ত শক্তির উৎস প্রকৃতি, সেই শক্তিকেই বিভিন্ন রূপে ব্যবহার করছে মানুষ। তাঁর বিশ্বাসই সঞ্চারিত হয়েছে চরিত্রের মধ্যে। কাল্পনিক ইতিহাস-আশ্রিত নাটক 'দেবী সর্পমস্তা' অরণ্য এবং অরণ্যবাসী মানুষকে নিয়ে রচিত। এই নাটকেও আছে প্রকৃতির ওষধি গুণের কথা। অসুস্থ জ্বরতপ্ত গৌরীকে ডাহুক সুস্থ করে তুলেছে লতাপাতার রস দিয়ে, আবার উদাস বিষবল্লরী খেয়ে ফেললে ডাহুক নিদান দিয়েছে ঃ

> " হা বাপ চিল পাড়িস না, তোহর মা জাগি আছে। চল্ ! হাঁট ! ছোট মোর সাথে ... ত্বরা চল্। তোহরে নিদান দিই ! ... ঘুমাবি না ! বাপ মোর ! আঁখিপাতা মুকত রাখ ... চল্ বাপ, বনে চল্ ... বনের বিষের নিদান আছে বনে !"[৫১]

নাট্যকার এখানে প্রাচীন ভারতীয় প্রাকৃতিক চিকিৎসাপদ্ধতির ওপর আস্থাশীল। দেবী সর্পমস্তা রূপে গাছটির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে গৌরীর, সেই গাছটিও নাটকে একাধিক ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত। আরণ্যক সংস্কারের পাশাপাশি গাছটির বিবর্তন গৌরীর মানস-পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রথমে গাছটি মরা, গৌরীর বিষণ্ন মনের মতোই নির্জীব, গৌরী যখন লোকেন্দ্রপ্রতাপকে বিয়ে করে সিংহগড়ে যাবার ভাবনায় আনন্দোচ্ছল, তখন কচি পাতা বেরিয়েছে গাছের পাঁজর ভেদ করে। নাগরিক জটিলতা, কৃত্রিমতার বিপরীতে এখানেও আরণ্য-প্রকৃতিকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন মনোজ মিত্র। সেই বৈপরীত্য উপলব্ধি করেছেন লোকেন্দ্রপ্রতাপ ঃ

> " পিতার মৃত্যুর পর মাত্র পনেরো বছর বয়সে আমি সিংহাসনে বসি। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও আমি স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারিনি। চারদিকে শত্রু ! চারদিকে থাবার মধ্যে

হৃৎপিন্ড হিম হয়ে আসছিল। এই যে ক'টা দিন বনে আছি, প্রাণ ভরে বাঁচছি ! যেন স্বপ্নে বাঁচছি ! এই বন পাহাড়ের এত যে মায়া ...''[৫২]

মানুষকে এই প্রাকৃতিক শুশ্রূষার কাছেই পৌঁছে দিতে চান মনোজ মিত্র। তাই স্মরণ করান ইতিহাসের সত্য — এই বনপাহাড় বারবার রক্ষা করেছে সংকটাপন্ন নগরসভ্যতাকে, এই হ'ল এদেশের শক্তিভান্ডার ! লোকেন্দ্রপ্রতাপ তাই ইচ্ছার সাহচর্যে ফিরে পায় পৌরুষ, অরণ্যের মানুষকে সঙ্গে পায় সিংহগড় উদ্ধারে। প্রকৃতি ফিরিয়ে দেয় মানুষের হৃত সম্পদ। প্রকৃতির এই স্নেহশীলা, গৌরবময় মূর্তিই দেখেন ও দেখাতে চান মনোজ মিত্র।

মনোজ মিত্রের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি অনেকসময়ই দার্শনিকতার স্তরে উন্নীত হয়েছে। জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে মৌল সত্যকে তুলে এনেছেন তিনি। সে সত্যকে এমন শিল্পিত রূপে প্রকাশ করেছেন যে, তা হয়ে উঠেছে যেকোনো জীবনের পক্ষে প্রযোজ্য নির্বিশেষ সত্য। ভাষার ওপর তাঁর দখল প্রশ্নাতীত। সেই ভাষা দিয়ে এমনভাবে তিনি দার্শনিক উপলব্ধিকে উপস্থাপিত করেন, যা সহজেই পেয়ে যায় কাব্যিক গুণ। 'নাকছাবিটা' নাটকের শেষে এই দার্শনিকতা শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে জানকী আবিষ্কার করেছে, তার জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা সবই বড় মিছে ! জীবন তার কাছে যেন একটা হেঁয়ালি, একটা ঠাট্টা। কিন্তু মনোজ মিত্র জানেন, জীবন অনেক বড়ো, সেখানে প্রতিটি মুহূর্তই নতুন। অনাগত সেই মুহূর্তের দিকেই তিনি মানুষকে আহ্বান জানান কাব্যতীর্থর বাচনে ঃ ''জীবন সহজে শ্যাষ হইবার নয়। ফুরাইবার নয়। তুমি অহনো জানো না, পর মুহূর্তে তোমার জন্য কী আছে। হ, লাইফ ইজ ফুল অব সারপ্রাইজ ! আসো না, নতুন কইরা বাঁচি। সবাই মিলা।''[৫৩] এই প্রত্যয়ই তো জীবন। এই নতুন করে বাঁচার আকাঙ্ক্ষাই তো জীবন। নুকু (জানকী)-র শঙ্খমুক্তার নাকছাবি খোয়া গেছে, তাই চিত্রা আর কাব্যতীর্থ নিজেদের সাধ্যের মধ্যে ঝুটা পাথরের একটি নাকছাবি বানিয়েছে। কিন্তু কোন্‌টা ঝুটা আর কোন্‌টা সত্য — সে বিচার কি সত্যিই সম্ভব ঃ ''কিন্তু কে কইতে পারে, আগামীকাল কেউ আবিষ্কার করতেও পারে, ঝুটা না, এইখানাই আসল শঙ্খমুক্তা ! সমুদ্রের গর্ভে ঝিনুকে জন্ম নিছে ... ভারি শুদ্ধ ... ভারি পবিত্র ... '' [৫৪] সত্য জন্ম নেয় হৃদয়ের তাপে। নুকুর জন্য সেই উত্তাপ আছে চিত্রা আর কাব্যতীর্থর। তাই ঝুটা পাথর-ই সেখানে সত্য হয়ে উঠবে আসল শঙ্খমুক্তার মতো, হয়ে উঠবে শুদ্ধ এবং পবিত্র। ব্যঞ্জনায় আরো একটি দার্শনিক ভাবনার ইঙ্গিত আছে এই নাটকে। ভালোবাসা কখন কোন্ রূপে প্রকাশ পায় বলা কঠিন। একসময় কাব্যতীর্থকে সহ্য করতে পারত না চিত্রা। শেষে সেই কাব্যতীর্থকে চিত্রার বাড়িতে দেখে জানকীর মতোই আমাদেরও চমক লাগে। চিরকালের 'স্টান্টবাজ' চিত্রার এও কি এক স্টান্ট! বীরেশ্বর রক্ষা করেছিল, ঠাঁই দিয়েছিল কাব্যতীর্থকে — সেকথা মনে রেখেই যেন চিত্রা স্থান দিয়েছে তাকে। ভালোবাসার এ এক অন্যতর প্রকাশ। কেবল 'স্টান্ট' বলে তখন আর মনে হয় না বিষয়টিকে। নাট্যকার কিন্তু বিষয়টিকে ভাঙেন না বা বিশদ করেন না, একটা অস্পষ্ট রহস্যময়তা রেখে দেন। এই রহস্যময়তাতেই সৌন্দর্যের বিকাশ। একটা আলো-আঁধারি, একটা বোঝা-না-বোঝার মধ্যে দোলায়িত হয় পাঠক-দর্শকের চিত্ত, মনে হয় কী যেন একটা ছোঁয়ার আছে অথচ ছোঁয়া যাচ্ছে না।

মহাভারত-আশ্রিত নাটকগুলির মধ্যে দার্শনিক ভাবনা সবচেয়ে প্রবল 'তক্ষক'-এ। জীবন এবং মৃত্যু যে আপাত সত্য মাত্র, কোনোটিই যে চরম সত্য নয়, তা দেখিয়েছেন মনোজ মিত্র এই নাটকে।

আপাত-বিপরীত মনে হলেও জীবন এবং মৃত্যু অভিন্ন, তারা একই দেহে লীন। ঋষি শমীক যতবার পরীক্ষিৎকে আকৃষ্ট করেছেন জীবনের দিকে, ততবারই তার পুত্র শৃঙ্গী মৃত্যু-রূপে হানা দিয়েছে। পিতা-পুত্র তাঁরা জীবন-মৃত্যু। মৃত্যু জীবনেরই সন্তান। এই মৌল সত্য যেদিন উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায় মানুষের কাছে, সেদিন মানুষ মৃত্যুভয়ের অতীত হয়। পরীক্ষিৎ জেনেছে সেই সত্য, তাই আর সে ভয় পায় না মৃত্যুকে। সে বুঝেছে, মৃত্যুকে ভয় করে বাঁচা সম্ভব নয়। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুকে আঘাত করে, পরাজিত করেই জীবন-উপভোগ সম্ভব। তাই তাঁর দৃপ্ত উচ্চারণ ঃ " মরতে আমার ভয় নেই ঋষি, লজ্জাও নেই ! হ্যাঁ, সপ্তম দিনে আমি মরব। সপ্তম দিন ! সপ্ত সমুদ্র দূরে ! তার পূর্বে ছয় দিন আমি বাঁচব,বিরাট হয়ে বাঁচব !"[৫৫] পরীক্ষিতের মধ্যে যখন এই উপলব্ধি জেগেছে তখন তক্ষক তাঁর পায়ের কাছে ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। নিজের বিষে সে জ্বলছে আর ছটফট করছে — মৃত্যুর ওপর জয়ী হয়েছে জীবন। 'অশ্বত্থামা' নাটকেও বলেছিলেন মৃত্যুর ওপর, ধ্বংসের ওপর জীবনের জয়ের কথা। তাই ক্রমাগত হত্যা আর ধ্বংসে ক্লান্ত অশ্বত্থামাকে অস্থির করে তুলেছে এক বৃহৎ সৃজনের বাসনা। সে উচ্চারণ করেছে আর্ত প্রাণের ব্যাকুলতা ঃ "বলো মহারাজ যতো প্রাণ নাশ করেছি আমরা, তত প্রাণ সৃজন করব আমরা ! বলো মহারাজ, এই ধরিত্রীর তৃণমূলে জল দেব ! তাকে লালন করব ! অনাবৃত ধরণীর উলঙ্গ রূপ ঢেকে দেব পল্লবিত বিকাশে..."[৫৬] কিন্তু সৃজনের জন্য, শান্তির জন্যও চাই শক্তি। ধৃতরাষ্ট্রকে তাই প্রবল শক্তির মোকাবিলা করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রবলতর শক্তিধর বাহিনীর সংস্থান করতে হয়েছে ('যা নেই ভারতে')। রাজপুরীর পরিত্যক্ত যে সন্তানেরা বনে-জঙ্গলে বড় হয়েছে, সেই সন্তানদের আহ্বান জানিয়েছে ধৃতরাষ্ট্র। আহ্বান জানিয়েছে দেবতা-সাধু-যোদ্ধাদের মিলিত চক্রের বিরুদ্ধে জয়ী হতে। মনোজ মিত্র মহাভারতের অনালোকিত অধ্যায়ে আলো ফেলে দেখিয়েছেন, মহাকাব্য যাদের যুদ্ধোন্মাদ আখ্যা দিয়েছে, সেই ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী শান্তির জন্যই লড়েছিলেন। মহাভারতীয় প্রেক্ষাপটে মনোজ মিত্র দেখান চিরন্তন জীবনসত্য — ক্ষমতা দখল এবং ভোগ করার জন্য যুদ্ধবাজ রাজনীতিবিদদের যুদ্ধোন্মাদনা এবং তার বিপরীতে বঞ্চিত মানুষের প্রতিরোধ। মহাভারতীয় সিদ্ধরসকে ভেঙে দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন আধুনিক ভারতীয় জীবনকেই। যে অন্ত্যজ, মন্ত্রবর্জিতদের ধৃতরাষ্ট্র আহ্বান জানিয়েছে তাদের কথা আরো একাধিক নাটকে বলেছেন মনোজ মিত্র। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, 'দেবী সর্পমস্তা' এবং 'ছায়ার প্রাসাদ' নাটক দুটির কথা। প্রথমটিতে সিংহগড়ের রাজা লোকেন্দ্রপ্রতাপের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আরণ্যক অধিবাসীরা। অরণ্য-নারী ইচ্ছার সাহচর্যে রাজা ফিরে পেয়েছেন পৌরুষ। ডাহুকের কণ্ঠে মনোজ মিত্র শুনিয়েছেন অরণ্যচারী মানুষের ত্যাগের ইতিহাস ঃ "রামরাঘব যঁবে এল বনবাসে, কাহারা দিল রে ঠাঁই? মোদের পূর্বপুরুষ ! রাজ্যহারা পান্ডব আসে বনবাসে, মোদের পূর্বপুরুষ পরাণ দিল জতুঘরে পুড়ি ! হরিশ্চন্দ্র রাজায় ঠাঁই দিল চন্ডালে।"[৫৭] পক্ষান্তরে নগর সভ্যতা চিরদিন উপেক্ষাই করেছে এই বন-পাহাড়ের মানুষকে, এখানকার শক্তি-ভান্ডারকে। রাজ্যের কোনো সুফল এরা কোনোদিন ভোগ করে না, শাসক কোনোদিন প্রজা বলে এদের লালন করে না। তবু এঁরাই এগিয়ে আসে ত্যাগে। 'ছায়ার প্রাসাদ' নাটকে দ্বৈপায়ন ঠাকুর ব্যক্তিমানুষ হয়েও এই প্রান্তিক শ্রেণিরই প্রতিনিধি। এই শ্রেণির মানুষেরাই অবহেলায়, অনাদরে ছড়িয়ে থাকা সবকিছুকে সংহত করে, হয়ে ওঠে সভ্যতার চালিকাশক্তি। ইতিহাস শাসকের কথা বলে, এদের ভুলে যায়, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসের স্রষ্টা এঁরাই। মনোজ মিত্র নিজের সৃষ্টির মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান সেই অনাদৃত, অবহেলিতদের।

যে সহানুভূতির প্রকাশ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রান্তিক মানুষের প্রতি, পারিবারিক ক্ষেত্রেও সেই সহানুভূতির অভাব পীড়িত করেছে মনোজ মিত্রকে। কেবল মানুষ নয়, মনুষ্যেতর পোষ্যদেরও জড়িয়ে যে জীবন ফেলে এসেছেন ধূলিহরে, কোলকাতার নাগরিক প্রেক্ষাপটে সেই জীবনবোধের অভাবে বারবার বেদনার্ত হয়েছেন। মানুষে মানুষে সম্পর্কের যে দৃঢ় ভিত্তি মনোজ মিত্রের অন্বিষ্ট, তা ভেঙে পড়ার সূত্রে দার্শনিক সত্যের উদ্ভাসন ঘটেছে 'বৃষ্টির ছায়াছবি' একাঙ্কটিতে। নাট্যকার মনোজ মিত্র এখানে দেখিয়েছেন, প্রতিটি মানুষের জীবনই মৌলিকভাবে এক। প্রত্যেকেই আসলে এক একটি চরিত্রের অভিনেতা। তাই "সব চন্দনারাই নন্দিতা ... সব নন্দিতারাই ..."[৫৮] আসলে সব গল্পই ঘুরেফিরে সেই একইরকম। তাই মানুষকে ভুলতে হয়। নাটকের শুরুতে অভিনেত্রী চন্দনা অভ্যাস করছিল 'অয়দিপাউস' নাটকের সংলাপ ঃ " তুমি ভুলে যাও অয়দিপাউস। এসব কথা ভুলে যাও। এ জীবনে যদি বাঁচতে হয় তো এসব কথা মনে রাখতে নেই। এ পৃথিবীতে যে ভুলতে পারে সেই বাঁচতে পারে। ভুলে যাও অয়দিপাউস, তুমি ভুলে যাও।"[৫৯] চন্দনা ভুলে গেছে তার অতীত জীবন, ভুলে গেছে ওপরে ওঠার পথে মাড়িয়ে আসা সব পাঁক। আগন্তুক ছেলেটি কেন আবার মনে পড়ায় সেসব! বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় চন্দনার সংটলেকের ফ্ল্যাটে উঠে আসে 'অয়দিপাউস' নাটকের নতুন ভাষ্য। কিছু মুহূর্তের জন্য গুলিয়ে যায় পাগলামি আর সুস্থতা। সত্য হয়ে ওঠে ছেলেটির সংলাপ ঃ "এটা এমন একটা রোগ — পৃথিবীর সব লোককেই প্রমাণ করতে পারো অসুস্থ, আবার সুস্থও বলতে পারো। মানে অসুস্থ বলেও চিনতে পারবে না, আবার সুস্থ বলেও না।"[৬০] আসলে ভুলতে না পারলেই মানুষ 'পাগল' হয় আর পারলে সুস্থ হয়। ভুলে থাকা তাই সুস্থ হয়ে বাঁচার আবশ্যিক শর্ত।

খুলনা অঞ্চলে যখন শৈশব অতিবাহিত করেছেন মনোজ মিত্র তখন সেখানকার জীবন ছিল শিথিল। আধুনিকতার তাড়া তখনো সেখানে লাগে নি। ফলে জীবন ছিল নিছক যাপন করার নয়, বরং উপভোগ করার। জল-জঙ্গল-প্রকৃতি, মানুষ, মনুষ্যেতর জীব নিয়ে সে ছিল সমগ্র জীবন, আধুনিক নগর সভ্যতার মতো ক্লিশে খণ্ডজীবন নয়। মনোজ মিত্রের চেতনায় স্থিত সেই সহজ, সমগ্র জীবনের ছবি। নিজের রচনায় জীবনকে তাই তিনি আঁকেন বৃহত্তর ক্যানভাসে। সেই ক্যানভাসে ফুটে ওঠা সবগুলি ছবিই যে অবশ্য প্রয়োজনীয় এমন নয়, তবে সমস্তটা মিলেমিশে তা একটা সমগ্রতার আভাস সৃষ্টি করে। মনোজ মিত্র এই সমগ্রতার সন্ধানী। তাঁর নাটকে জীবন তাই ছড়ানো। আপাতদৃষ্টিতে এই বিস্তৃতি কোথাও কোথাও প্লটের শিথিলতা মনে হলেও জীবনের সম্পূর্ণতার দিক থেকে তা তাৎপর্যপূর্ণ। 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে তাই জটার আত্মহত্যা করে মরে যাওয়া স্ত্রী-র কথা আসে, বাগ্‌দী পাড়ায় হরগৌরীর নাচের কথা আসে, অঘোর ঘোষের পাল্কি টেনে বেহারার কাঁধে সৃষ্টি হওয়া চিরস্থায়ী 'প্যাঁচড়া'র কথা আসে। আর এই সব কিছু আসার মধ্যে কোনো তাড়াহুড়ো নেই। সহজ গল্পগাছার মধ্য দিয়ে এমনভাবে এইসব বিষয় উপস্থাপিত করেন মনোজ মিত্র যে, নাট্যচলনে তা স্বাভাবিকভাবেই খাপ খেয়ে যায়। সমগ্রতার কারণেই 'কেনারাম বেচারাম' নাটকের প্লটে ঠাঁই পেয়ে যায় নেতা, পুলিশ সকলেই। ভাগ্নে ভৈরবও সেখানে অপ্রাসঙ্গিক থাকে না। 'দম্পতি' নাটকে অনায়াসে জায়গা করে নেয় দোলন বা অরূপ, রামদেও বা ম্যানেজার বা রহমান। কর্তা-গিন্নীর কলহকে একটু নিরপেক্ষ তৃতীয় দৃষ্টিতে দেখার জন্যই যেন গোয়ালা রামদেও বা নাপিত পেল্লাদ চরিত্রের অবতারণা। দীঘার হোটেলের ম্যানেজার এবং বেয়ারা রহমান নাটকে কমিক রিলিফ সৃষ্টি করেছে। 'শোভাযাত্রা' নাটকে রান্নার ঠাকুর ঝড়েশ্বরের সঙ্গে ধনগোপাল-অতসী-সরসীর যে কথোপকথন তা গ্রামীণ বাংলাদেশের

উৎসবের সহজ আন্তরিকতার সুরকে স্পষ্ট করেছে। ঝড়েশ্বর রাঁধুনিমাত্র, কিন্তু উৎসবের সূত্রে এমন সম্পর্ক তার গড়ে উঠেছে যজমান পরিবারের সঙ্গে যে, নিজের সন্তান জন্মের সংবাদ দেয় সে এক বোতল করে ঘি নিয়ে এসে। ঝড়েশ্বরকে নিয়ে যে রসিকতা তাতেও উৎসবের সহজ আন্তরিক সুরটিই ফুটে উঠেছে। একই আন্তরিকতার প্রকাশ এন্তাজের সংলাপেও।

এইসব টুকরো টুকরো ছবি এঁকে মনোজ মিত্র খোঁজেন জীবনের পরিপূর্ণতাকে। তিনি আগে তত্ত্ব ভেবে নিয়ে জীবনকে সেই ছাঁচে ঢালাই করেন না। তিনি সন্ধান করেন জীবনের বৈচিত্র্য, জীবনের পরিপূর্ণতা। সেই সন্ধানে যা উঠে আসে তাকেই ধরে দেন পাঠক-দর্শকের সামনে। কোনো বিশেষ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার দায় তিনি গ্রহণ করেন নি। তত্ত্বের চেয়ে জীবন যে অনেক বড়ো সেকথা তিনি নিজে বুঝেছেন এবং সেই বোঝাটাই সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন। জীবনের পরিপূর্ণতার সন্ধানী বলেই 'আঁখিপল্লব' নাটকে আঁখি এবং পল্লবের ঘরের পাশে খুরশিদের পরিবার, এমনকি তার পোষ্য ভালুকটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। খুরশিদের বোনদের প্রতি আঁখির বিরূপতা দূর হয়ে যায়। যে মুরগিছানার ডাক একসময় বিরক্তি উৎপাদন করত, তাই কত কাছের মনে হয়। বস্তি ছাড়ার কথা আর ভাবে না আঁখি, খুরশিদের বোনেদের ওপরই দায়িত্ব দেয় পল্লবের দেখাশোনার। এই রমণীয় প্রশান্তি, এই স্নিগ্ধ পরিপূর্ণতাতে পৌঁছনোই মনোজ মিত্রের অভীষ্ট। এই সমগ্রতার প্রেক্ষাপটেই অশ্লীলতাও জীবনের অংশ হয়ে ওঠে। 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে হরগৌরীর নাচ দেখতে যাবার প্রসঙ্গে জটা যে অশ্লীলতার ইঙ্গিত করেছে তা সুন্দরবন অঞ্চলের নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলে গেছে। কিংবা ধরা যাক, 'সাজানো বাগান'-এর বাঞ্ছারামের কথা। 'শালা' শব্দটি যেন তার বাচনভঙ্গির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই শব্দটি কিংবা এর চেয়ে আরো গভীরতর 'অশ্লীল' শব্দ যখন বাঞ্ছা ব্যবহার করে তখন তা একটুও অসঙ্গত মনে হয় না মনোজ মিত্রের চরিত্র নির্মাণ ও পরিস্থিতি বয়নের কৌশলে। সারা জীবন রক্ত জল করে যে বাগান গড়েছে বাঞ্ছা, তার প্রতি লোভ মৃত্যুর পরও ছাড়তে পারেন নি জমিদার ছকড়ি দত্ত। ভূত হয়ে তিনি ঠাঁই নিয়েছেন সেই বাগানে। সেই ভূতের প্রতি বাঞ্ছার ক্ষোভ ঃ ''ওঝা ডেকে তোমারে সোজা করে দেবো ! বাঞ্চোৎ। আমার নেবুগাছে চড়ে পোঁদপাকামি হচ্ছে।''[৬১] এই বাচনভঙ্গি এবং তৎসংক্রান্ত অশ্লীলতা বাঞ্ছাদের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ক্রোধ প্রকাশের ভাষা তাদের এরকমই। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের কবিতার অশ্লীলতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন ঃ

> ''যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের হৃদয়েস্থিত কদর্য্যভাবের অভিব্যক্তি জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা তাহা পবিত্র সভ্যভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে।... যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল, তিনি ধর্মাত্মা। যিনি ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে অশ্লীল তিনি পাপাত্মা''[৬২]

মনোজ মিত্রের চরিত্রের যে অশ্লীল-বাচন, তা 'ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে' নয়, তা ক্রোধবশত অথবা চরিত্রের স্বাভাবিক জবানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। চরিত্রগুলির জীবন ও প্রতিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এই অশ্লীলতাকে জীবনের স্বাভাবিক চলনের অঙ্গীভূত বলেই মনে হবে। প্রকৃতপক্ষে গ্রামবাংলার মানুষের সংলাপে আমরা এখনো এমন অনেক শব্দ ব্যবহার দেখতে পাই, যা তথাকথিত নাগরিক দৃষ্টিতে অচল। অথচ গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সে শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। 'গুয়োর ব্যাটা', 'কাপ্তিন',

'এঁটুলি', 'হারামজাদা' প্রভৃতি যেসব বিশেষণে বাঞ্ছা ভূষিত করেছে গুপিকে, সেগুলি নাগরিক বিচারে সবসময় শ্লীল এমন বলা যাবে না, কিন্তু এগুলি তার লজ্জ, যা থেকে বিচ্ছিন্ন করলে বাঞ্ছার মতো চরিত্রের স্বাভাবিকতা এবং সঙ্গতি নষ্ট হয়। গুপি নিজের সন্তানের আগমন-সম্ভাবনা জানিয়েছে বাঞ্ছাকে। সেই সংবাদে বাঞ্ছার প্রতিক্রিয়া বাঞ্ছারই মতো ঃ

> "চার মাস ... চার মাস তোমাদের টাইম দিয়েছিলাম - চারমাসের মধ্যে এট্টা কাজকম্মো জুটুয়ে তোমরা তোমাদের মতো চলে যাবা — আমি আমার মতো চলে যাবো। তো কাজের মধ্যে তোমরা এই কাজ করলে ! বসে বসে পরের টাকা খেলে — বাগানের নিমগাছের হাওয়া খেলে — আর করার মধ্যে এই কম্মো ?"[৬৩]

এই অশ্লীলতা আরোপিত নয়, জীবনের তাপে সঞ্জীবিত।

মনোজ মিত্র বারংবার সমকালীন সভ্যতার দুর্বলতাকে বিদ্রূপ করেছেন। তাঁর এই পরিহাস একটা অস্ত্র। সমসাময়িক সমাজে যেভাবে মানবিক বোধ হারিয়ে যাচ্ছে, যেভাবে জীবন পণ্য হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে, অর্থ যেভাবে মানবিকতার স্থানে অধিষ্ঠিত হচ্ছে তাকে তিনি বারবার আঘাত করেছেন। এই আঘাত করার জন্য তাঁর কাহিনি অনেক সময় কিছুটা বানিয়ে তোলা বলে মনে হয়, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য এই সমাজের মানুষকে হাসি এবং বিদ্রূপের মাধ্যমে জীবনের তাৎপর্য সম্বন্ধে সচেতন করা। অর্থ উপার্জন নয়, মানবিক মূল্যবোধ অর্জনই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় — এই একটি কথা তাঁর নাটকে বারবার ঘুরে আসে। এই মূল্য সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণাই তাঁকে কখনো পরিহাস করায়, কখনো ক্রুদ্ধ করে তোলে, কখনো করে সহানুভূতিশীল। অন্তরের তীব্র ক্রোধকে সুকৌশলে পরিহাসের মোড়কে মুড়ে রেখে সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশ করার ক্ষমতা তাঁর অধিগত। এই ক্রোধ কখনো স্পষ্ট, যেমন — 'চাক ভাঙা মধু' বা 'নেকড়ে' নাটকে, কখনো বিদ্রূপময়, যেমন — 'নরক গুলজার', 'শিবের অসাধ্যি' বা 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে, আবার কখনো সহানুভূতিতে বিগলিত, যেমন — 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'য়।

মনোজ মিত্রের জীবনদৃষ্টির মূল কথাটি হ'ল জীবনের অর্থ সন্ধান। নিজের সৃষ্টিগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর লক্ষ্য প্রধানত জীবনকে অর্থবহ করে তোলা। এই করে তোলার পথে বাধা অনেক। সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতিকূলতা যেমন আছে, তেমনি আছে মানুষের লোভ-ঘৃণা-হিংস্রতা-প্রভুত্ববাসনার কারণে সৃষ্ট প্রতিকূলতাও। আধুনিক ভোগবাদী, বিলাসপ্রিয়, আত্মকেন্দ্রিক সমাজে তিনি প্রতিনিয়ত দেখেছেন মূল্যবোধের বিনষ্টি। কিন্তু এই বিনাশকেই চরম বলে স্বীকার করেন নি তিনি। অসৎ এবং অমঙ্গলের সঙ্গে যে প্রতিনিয়ত মানুষের লড়াই চলছে, সেই লড়াইকে তিনি প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন নিজের নাটকে। রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি বিশ্বাস করেছেন যে, মানুষের মধ্যেকার শুভচেতনার জাগরণ অবশ্যম্ভাবী। তাঁর নাটক সেই জাগরণের পথের দিশা দেখায়। জীবনের যে মূল্যচেতনায় তিনি বিশ্বাস করেন, সেই চেতনার সন্ধান পেয়েছেন অতীত কালে। অতীতের সেই জীবনবোধকেই তিনি ফিরিয়ে আনতে চান, লালন করতে চান। এই কাজে তাঁর প্রধান অবলম্বন সাধারণ মানুষ। এই মানুষেরাই লালন করে জীবনের সুকুমার এবং সদর্থক বৃত্তিগুলিকে, এরাই সচল রাখে সভ্যতার চাকা। এর পাশাপাশি মনোজ মিত্র প্রকৃতির মধ্যে দেখেছেন শক্তির রূপ। প্রকৃতির শুশ্রূষা আধুনিক জীবনের শূন্যতা মোচন করতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করেছেন।

জীবন মানে তাঁর দৃষ্টিতে কেবল বেঁচে থাকা নয়, জীবন হ'ল সদর্থক এক অস্তিত্ব। আধুনিক সমাজ এবং রাষ্ট্র যখন কেবল নিজের অস্তিত্ব নিয়েই চিন্তিত, যখন অন্যের অস্তিত্ব বিপন্ন করে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠাই প্রধান লক্ষ্য, তখন মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে বাঞ্ছারামের অস্তিত্ব রক্ষায় অনেক মানুষের বাড়িয়ে দেওয়া হাতকে তুলে ধরেন। যারা হাত বাড়িয়ে দেয় বাঞ্ছার অস্তিত্ব রক্ষায়, তাদের অস্তিত্বও বাঞ্ছার অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল। আবার তিনি সৃষ্টি করেন জিতেনবাবু বা অলকানন্দার মতো চরিত্র, অন্যের অস্তিত্ব রক্ষাকেই যাঁরা জীবনের সার্থকতা বলে মনে করে। বাদামী, বেচারাম, তুষ্টু চামার বা ঘন্টাকর্ণের মতো যারা সবলের পীড়নে অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি দাঁড়ায়, তাদেরও তিনি জয়ী করেন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে। অস্তিত্ব-ভাবনার পাশাপাশি মৃত্যুচেতনাও জীবনদৃষ্টির অঙ্গীভূত। মৃত্যুর বিপরীতে জীবনের প্রতিষ্ঠাই মনোজ মিত্রের নাটকের উপজীব্য। তাই তাঁর নাটকে রেললাইনে গলা দিতে গিয়েও বেঁচে যায় কেনারাম, মরতে মরতে বেঁচে ওঠে বাঞ্ছারাম, শেষ পর্যন্ত গাছ থেকে নেমে আসে 'জ্যান্ত' তুষ্টু, সিঁড়ির নিচের ঘরে বেঁচে থাকে বঙ্কিম। মৃত্যুর ওপরে জীবনকে প্রতিষ্ঠা দেন বলেই তাঁর পরীক্ষিৎ নিশ্চিত মৃত্যুর আগে প্রবল হয়ে বাঁচার প্রত্যয়ে দৃঢ় হয়, জীবনের প্রাবল্যে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে দেয়।

মনোজ মিত্র জীবনের দিকে তাকিয়েছেন প্রসন্ন দৃষ্টিতে। তাই তাঁর নাটকে সব আধুনিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়, ষড়যন্ত্র-জটিলতাকে অতিক্রম করে সত্য হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ এক আশ্রয়ের আশ্বাস, জীবনের বহুমাত্রিকতাকে উপলব্ধির অনুভব। এই প্রসন্ন দৃষ্টির কারণেই জীবন তাঁর কাছে বর্ণিল এবং আনন্দময়। যে কোনো পরিস্থিতিতেই যে তাঁর চরিত্ররা জীবন নিয়ে রসিকতায় মেতে উঠতে পারে তার গভীরে রয়েছে নাট্যকারের জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতা। মৃত্যু বা বিচ্ছেদকে নিয়েও পরিহাসের খেলায় মেতে উঠতে পারে তাঁর চরিত্র। এই বিষয়টিকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েছেন সমালোচক ঃ

> "তাঁর কাছে জীবন হাজার যন্ত্রণা, প্রতিকূলতা, ক্ষুদ্রতা, সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে মহান আর সাগরের মতোই গভীর রহস্যময়। তাই তাঁর কলমে মৃত্যুও ভয়ংকরতাকে অতিক্রম করে বিনোদনের উপলক্ষ হয়ে ওঠে।"[৬৪]

জীবনের বিচিত্র, বহুমাত্রিক রূপ তিনি দেখেন — সেই দেখার আশ্রয় কোনো তত্ত্ব নয়, মানুষ। সেই মানুষ, যার মধ্যে ঃ "সহস্র জটিলতা, আলো-আঁধার, লোভ-উদারতা, প্রেম আর নিষ্ঠুরতার দুরূহ দ্বান্দ্বিক সমন্বয়।"[৬৫] এই মানুষেরা তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় 'দোষ, গুণ, নীচতা, স্বাভাবিকত্ব আর অস্বাভাবিক আচরণের' সমন্বয় রূপে। সব দেখিয়েও শেষপর্যন্ত তাঁর ফিরে আসা কিন্তু মানুষের শুভবোধের কাছে, সদর্থক অস্তিত্বের কাছে। জীবনের প্রতি এই হ'ল তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি। সব ধ্বস্তভূমি পার হয়ে তিনি নিজে পৌঁছতে চান, তাঁর পাঠক-দর্শককে পৌঁছে দিতে চান এক শান্ত, স্নিগ্ধ, ছায়াসুনিবিড় জলাশয়ের কাছে। হতে পারে সময় প্রতিকূল, হতে পারে ভাঙনের প্রবল টান, কিন্তু নিজের বিশ্বাসের ভূমি থেকে স্খলিত হতে চান না মনোজ মিত্র। নিজে যা চান, সার্থক শিল্পরূপায়ণের মধ্য দিয়ে তাকে পাঠক-দর্শকের দরবারে উপস্থাপিত করাই তাঁর লড়াই। তাই তো শেষপর্যন্ত তাঁর নাটকে মেলে এক শীতল আশ্রয়। সেই প্রসন্ন জীবনদৃষ্টিকেই অভিনন্দিত করেছেন সমালোচক ঃ "শেষ পর্যন্ত কিন্তু ধর্মীয়

ভণ্ডামি, রাজনৈতিক শঠতা, অবাধ লুণ্ঠন আর চতুর পেষণের উপর মনুষ্যত্বকেই ভালোবাসাকেই আঁকড়ে ধরেন মনোজ আর তাঁর পাঠক বা দর্শক।''[৬৬] সংসার বা সমাজে কু-এর অভাব নেই। মনোজ মিত্র সেসব দেখেন এবং দেখান, কিন্তু তাঁর নিরন্তর অভিযাত্রা সু-এর সন্ধানে — সেই অভিযাত্রায় তিনি অনায়াসে সঙ্গী করে নেন পাঠক-দর্শককে। নিজের নাটকের থিম সম্পর্কে তিনি স্পষ্টই বলেন ঃ " My focus has always been on preservation and nourishment of values, of human resources."[৬৭] মানবসম্পদের এই রক্ষণ এবং পরিচর্যাতেই নিরলস মনোজ মিত্রের লেখনী।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে - মনোজ মিত্র ও অমর মিত্র - দে'জ পাবলিশিং কোলকাতা-৭০০০৭৩, জানুয়ারি ২০১১ - মাঘ ১৪১৭, পৃ.৩৭

২) ঐ, পৃ.৭১

৩) ঐ, পৃ.৬১

৪) ঐ, পৃ.২১

৫) ঐ, পৃ.১৭-১৮

৬) ঐ, পৃ.১৮

৭) বাঞ্ছারাম ঃ থিয়েটারে সিনেমায় - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩ - প্রথম প্রকাশ - মাঘ ১৪০৬, পৃ.৪৪

৮) কেনারাম বেচারাম - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ - মাঘ ১৪০৩, পৃ.১৬১

৯) ঐ, পৃ.১৫২

১০) মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - এর ভূমিকা - পবিত্র সরকার, পৃ.১১

১১) অলকানন্দার পুত্রকন্যা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.১৯৮

১২) রঙের হাট - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ - মাঘ ১৪১৩, পৃ.১৩৫

১৩) দন্তরঙ্গ - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড - প্রথম প্রকাশ 'রাসপূর্ণিমা', কার্তিক ১৪১০, পৃ.৩০০

১৪) ঐ, পৃ.৩১৬

১৫) দম্পতি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড - প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০২, পৃ. ২২২

১৬) ঐ, পৃ.২২৩

১৭) পালিয়ে বেড়ায় - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.১০৪

১৮) রাজদর্শন - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ - অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃ. ৮৭

১৯) মনোজ মিত্রের বিশ্বাসের জগৎ - বিষ্ণু বসু - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড - এর ভূমিকা, পৃ. ৪-৫

২০) নাকছাবিটা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ. ৪৬

২১) মুন্নি ও সাত চৌকিদার - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.১৬৮

২২) ঐ, পৃ.১৯৯

২৩) কুহুযামিনী - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড, পৃ.৯৩

২৪) পাখি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৪৩৩

২৫) ঐ, পৃ.৪৩৩-৩৪

২৬) কালবিহঙ্গ - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৪০৯

২৭) কোথায় যাবো - মনোজ মিত্র দশ একাঙ্ক - প্রথম সংস্করণ-মাঘ, ১৪০৭ - অপেরা১-৬৫,সূর্য সেন স্ট্রীট,কলকাতা-০৯, পৃ. ১৫২-৫৩

২৮) মহাবিদ্যা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৪০৮

২৯) অশ্বত্থামা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৭৯

৩০) শিবের অসাধ্যি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩১৯

৩১) মেষ ও রাক্ষস - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৮৫

৩২) চাক ভাঙা মধু - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.২০

৩৩) সুন্দরমের 'শোভাযাত্রা'- সীমা জয়ের নাটক - রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়-পশ্চিমবঙ্গ-বর্ষ ২৫, সংখ্যা ২৯,৩১-০১-১৯৯২

৩৪) শোভাযাত্রা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৪২

৩৫) ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে - মনোজ মিত্র ও অমর মিত্র, পৃ. ৬৪

৩৬) ঐ, পৃ.৬৪

৩৭) কিনু কাহারের থিয়েটার - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ - সৃষ্টি প্রকাশন - কলকাতা-০৯ - প্রথম প্রকাশ - বইমেলা, ২০০১, পৃ.১৪৪

৩৮) ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে - মনোজ মিত্র ও অমর মিত্র, পৃ.১৬

৩৯) কেনারাম বেচারাম - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.১১৮

৪০) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.১১

৪১) ঐ, পৃ.২৩- ২৪

৪২) ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে - মনোজ মিত্র ও অমর মিত্র, পৃ.২১

৪৩) ঐ, পৃ.৩৬

৪৪) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.২০

৪৫) ঐ, পৃ.২২-২৩

৪৬) নাটককার মনোজ মিত্র : জনপ্রিয়তার দুই দশক - সৌমিত্র বসু স্যাস-১৯৯৩, পৃ. ৮৭-৮৮

৪৭) ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে - মনোজ মিত্র ও অমর মিত্র, পৃ.৫৮

৪৮) ঐ, পৃ.৫৯

৪৯) গল্প হেকিমসাহেব - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.১৫১

৫০) ঐ, পৃ.১৪৮-৪৯

৫১) দেবী সর্পমস্তা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৩৮২

৫২) ঐ, পৃ.৩৭০

৫৩) নাকছাবিটা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৫৩

৫৪) ঐ, পৃ.৫৩

৫৫) তক্ষক - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৪৩৮

৫৬) অশ্বত্থামা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৭৮

৫৭) দেবী সর্পমস্তা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৩৬৯

৫৮) বৃষ্টির ছায়াছবি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৪১০

৫৯) ঐ, পৃ.৩৯১

৬০) ঐ, পৃ.৪০৬

৬১) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৬

৬২) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ - ভূমিকা - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - বঙ্কিম রচনাবলী - দ্বিতীয় খন্ড - কামিনী প্রকাশালয় - কলকাতা-০৯ - মাঘ ১৩৯৭, পৃ.৮৫২-৫৩

৬৩) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩৩

৬৪) নাটককার মনোজ মিত্র : ৪৮ বছরের জমি, জিরেত আর আকাশ - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড-এর ভূমিকা

৬৫) ঐ

৬৬) ঐ

৬৭) To preserve and nourish values-Interview to Sankar Mazumdar - The Statesman - 28/10/2005